আমি তারাশিস বলছি

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

আমি তারাশিস বলছি

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

জয়মাতারা পাবলিশার্স
কলকাতা - ৭০০ ০৬৮

প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ২০১৪

প্রকাশক:
জয়মাতারা পাবলিশার্স
২৫৫/২, যোধপুর পার্ক
কলিকাতা - ৭০০ ০৬৮
email: jaymatarapublishers@gmail.com

© শ্রীমতি মীরা গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রী অভিষেক দাশ

বর্ণসংস্থাপন :
শ্রী অনুপ কুমার খাঁ

মুদ্রণ :
মিনতিপ্রিন্টার্স,
১২ টেমার লেন, কলকাতা - ৯

লেখকের বই-এর website :
http://sites.google.com/site/thebooksoftarashisgangopadhyay

Facebook page :
http://www.facebook.com / tarashisauthor

লেখকের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়
Box No. - 10455
কালীঘাট পোস্ট অফিস
কলিকাতা - ৭০০ ০২৬
email:tarashisfans@gmail.com

ISBN NO : 978-93-82325-11-6

মূল্য - ৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। **মহেশ লাইব্রেরী**
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি - ৭৩
ফোন - ২২৪১ ৭৪৭৯

২। **দে বুক স্টোর**
১৩, বংকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি - ৭৩
ফোন - ২২৪১ ৯২৬৬, ৬৫১৬ ৬৬৯৫

৩। **দেজ পাবলিশিং**
১৩, বংকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি - ৭৩
ফোন - ২২১৯ ৭৯২০

৪। **বুক ফ্রেণ্ডস**
৮/বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলি - ৭৩
ফোন - ৯৮৩০২ ২৪০৯১

৫। **গিরিজা লাইব্রেরী**
২২/সি, কলেজ রো, কলি - ৯
ফোন - ২২৪১ ৫৪৬৮

৬। **সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার**
৩৮, বিধান সরণী, কলি - ৬
ফোন - ২২৪১ ১২০৮

৭। **নাথ ব্রাদার্স**
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি - ৭৩
ফোন - ২২৪১ ৯১৮৩

৮। **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

৯। **পূর্বাশা**
হাওড়া
ফোন - ৯৭৪৮৯২৭২১২

(বইমেলায় গিরিজা লাইব্রেরী এবং সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের স্টলেও পাওয়া যাবে)

আমার এই e book- টি আমার লেখনীর সকল অনুরাগী তথা অনুরাগিনী ভক্তকে উপহার দিলাম।

—ইতি

লেখক

AMI TARASHIS BOLCHI

by ***TARASHIS GANGOPADHYAY***

(This is the 1st e- book of Tarashis Gangopadhyay.It is the collection of blogs written by the saint author Tarashis Gangopadhyay in his google blog http://amitarashisbolchi.blogspot.in/)

লেখকের স্মৃতি থেকে কিছু ছবি

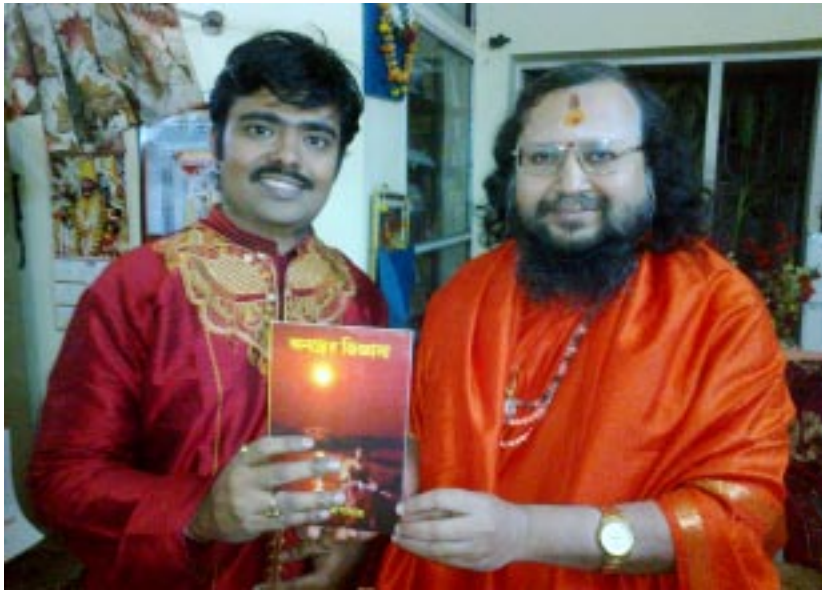

১৪১৯ বিদায়

বাংলা বছর ১৪১৯ আজকের দিনেই সমাপ্ত হচ্ছে। আগামীকাল থেকে শুরু হবে ১৪২০।

বিগত বছরটিতে আমরা হারিয়েছি অনেক, পেয়েছিও অনেক। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো — যা পেয়েছি তার মধ্যে কি যাবে আমাদের সঙ্গে শেষের দিনে? টাকাপয়সা, ঘরবাড়ি, প্রশংসা, নিন্দা — কি যাবে? কিছু না। যাবে শুধু আমাদের কর্ম। কি ভালো কাজ আমরা করতে পারলাম এই বছরে সেটিই লিখে রাখবেন চিত্রগুপ্ত। আর তার উপরই নির্ভর করবে আমাদের চিরন্তনের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। এখানে আমাদের প্রাপ্তির তালিকায় যোগ হবে — মানুষকে বা অন্য জীবদের কত ভালবাসতে পেরেছি, অপরের মুখে কত হাসি ফোটাতে পেরেছি, কত দরিদ্রের কাজে আসতে পেরেছি আর কত মানুষকে সৎপথে এগোতে সাহায্য করতে পেরেছি। সেইসাথে নিজের জপ বা সাধনা কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। এটাই হল আমাদের Credit। আর Debit কি হবে জানেন? কত মানুষের ক্ষতি করেছি, কতজনকে কটু কথা শুনিয়েছি, কত মানুষের চোখের জল ফেলেছি, কত মানুষকে ঠকিয়েছি, কত মিথ্যা বলেছি, কত অহংকার করেছি। এই দুটিকে মিলিয়ে চিত্রগুপ্ত করবেন আমাদের এই বছরের Audit আর তার ফল হিসেবে আমাদের চিরন্তনের Bank Balance ঠিক হবে। এখন আপনারাই ভেবে দেখুন — আপনাদের এই বছরের Balance Sheet কিরকম হবে? যদি দেখেন লাভের ঘরে রয়েছেন তবে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু যদি দেখেন লোকসানের ঘরে রয়েছেন তবে কিন্তু নিজেকে নিয়ে ভাবনার সময় এসেছে। আমি বলি কি — সেক্ষেত্রে আগামী বছরের জন্যে নতুন পরিকল্পনা নিন। যা গেছে তা তো ফেরাতে পারবেন না কিন্তু যেটা পারবেন সেটা করুন — একটি ডায়েরি নিন এবং তাতে রোজ কি ভালো কাজ করলেন আর রোজ কি খারাপ কাজ করলেন তা লিখে রাখুন এবং চেষ্টা করুন — রোজ যেন খারাপ কাজের উপরে থাকে ভালো কাজ। এভাবে চেষ্টা করতে থাকুন — খারাপ কাজ যেন দ্রুত কমিয়ে ফেলা যায় এবং ভালো কাজ বাড়িয়ে নেয়া যায়। যেদিন আপনার ডায়েরির পাতা শুধু ভালো কাজেই ভরে যাবে এবং খারাপ কাজ একটিও থাকবে না সেদিনই আপনি পাবেন যথার্থ আনন্দ — যে আনন্দের লক্ষ্যে আমাদের জীবনপথে নামা।

(১৪/৪/২০১৩)

দিন আসে, দিন যায়

দিন আসে, দিন যায়। ভালো দিন থাকেনা চিরকাল। দুঃখের দিনও থাকেনা। দেখতে দেখতে বয়স বাড়ে, আয়ু কমে এবং ফুরিয়ে যায় দিন। এসবই তো চলেছে, চলছে, চলবেই। কিন্তু আমাদের আসল কাজ যে এখনো বাকি। জীবনে কি করতে এসেছি? আর কি করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি? শেষ খেয়ার ডাক যখন আসবে তখন হাতে থাকবে তো শেষ পারানির কড়ি? বেলা যে বয়ে যায়। পথিক, খেয়াল আছে কি?

(১৪/৪/২০১৩)

ভয়জয়

আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ভয় যা আমাদের ভিতর থেকে কুরে কুরে খায়। এই ভয়টা কিন্তু পৃথিবী আমাদের দেয়নি। এটা আমাদেরই মনের নেগেটিভ এনার্জি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। একে দূর করার একটিই উপায় — নিজেকে একটু সময় দেয়া ও বোঝানো যে এটা শুধুই দৃষ্টিভঙ্গীর ভুল। এই পৃথিবীতে ভয়াবহ কেউ নয়। এই ভয়টা আমাদের দেখায় মন। তাই মনকে বোঝান — এই জীবনে ভয় পাওয়ার মত কেউই নেই। একটু প্রাণায়াম করুন — একটু শ্বাস-প্রশ্বাস। আস্তে আস্তে কমিয়ে আনুন শ্বাসের গতি। শ্বাসের গতি যত কমবে মন তত সমাহিত হবে আর ততই মন থেকে দূর হয়ে যাবে নেগেটিভ এনার্জির প্রকোপ।

(১৩/৪/২০১৩)

নববর্ষের শুভেচ্ছা

আজ বাংলা নববর্ষ। শুরু হল আরেকটি নতুন বছর। নতুন বছরের প্রথম দিন আমি বরাবর যাই কালীমন্দিরে। আজও গেছিলাম। মায়ের পূজা দেবার সময়েই আমার শিষ্য ভক্ত তথা সকল জীবের মঙ্গলকামনা করি। (এমনিতে নতুন বছরে যতক্ষণ না মন্দির দর্শন হচ্ছে আমার মোবাইল ফোন বন্ধ থাকে। মাকে দর্শন করে পূজা দিয়ে তবে সবার সাথে শুরু করি কথা। আজও তার অন্যথা হয়নি। আসলে মানুষকে শুভেচ্ছা জানানোর শক্তি আমার কোথায়? মায়ের কৃপাতেই তো হয় সব। তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা করেই বরাবর শুভেচ্ছা জানাই সকলকে) মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই আজকেও আপনাদের (যাঁরা আমার চেয়ে বয়সে বড়) ও তোমাদের (যারা সমবয়সী বা আমার চেয়ে বয়সে ছোট) সকলকে জানাই শুভেচ্ছা — নতুন বছর সবার ভালো কাটুক। নতুন বছর সবার কাছে বয়ে আনুক আলোর বার্তা। আমাদের জীবনে প্রতিটি বছরই উল্লেখযোগ্য — যে কাজের জন্যে আমাদের ধরাধামে আসা তা পূর্ণ করার একটি সুযোগরূপেই বছরটিকে দেখি আমি। ঠাকুরের চরণে শরণ নিয়ে এগিয়ে গেলে নিশ্চয়ই এই বছর আমাদের অনেকটা এগিয়ে দেবে আলোর ঠিকানার পথে। শুধু positive চিন্তা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব, সবার প্রতি বাড়িয়ে দেব ভালবাসার হাত এবং সবাইকে নিয়েই এগিয়ে চলব। আমরা সবাই অমৃতের সন্তান। তাই অমৃতের সূত্রে আমরা সবাই একে অপরের আত্মীয়। সেই আত্মীয়তা যেন নতুন বছরে সবার চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকে এই কামনাই করি। সবাই যেন মনে রাখি — এ বছরে আমাদের মুখ থেকে যেন একটি কটু কথাও না বেরোয়, আমাদের কথা বা কাজ যেন কারোর মনে আঘাত না দেয়, আমাদের দ্বারা কারোর যেন ক্ষতি না হয়। আমাদের মন্ত্র যেন হয় ভালবাসা। অপরকে ভালোভাবে বাঁশ দেয়ার আশা যেন দূর হয়ে যায় আমাদের মন থেকে। এইভাবে জীবনপথে অগ্রসর হলে আলোর ঠিকানায় পৌঁছতে দেরী যে হবে না এটা নিশ্চিন্ত। সেই শুভেচ্ছাই রইল আজকে সবার জন্যে। এভাবেই সার্থক হয়ে উঠুক বাংলা নববর্ষ ১৪২০।

(১৫/৪/২০১৩)

একা তবে একাও নয়

এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই ভীষণভাবে একা এবং একইসাথে আবার একাও নয়। মানুষ জন্মসূত্রে একা, এসেছে একা, যাবে একা, থাকার সময়টুকু শুধু অন্যের সাথে সুখী হবার চেষ্টা। এই পৃথিবীতে শুধু গুরু আর বাবা মা ছাড়া কেউ তার আপন নয়। বন্ধু, বান্ধবী, সঙ্গী, সঙ্গিনী, স্বামী, স্ত্রী সব ঋণানুবন্ধের সম্পর্ক। যতই ভালোবাসো, ঋণ মিটলেই ভোকাট্টা। তাই পৃথিবীর কোন সম্পর্কের মাধ্যমে একাকিত্ব দূর হবার নয়। একাকিত্ব শুধু যাবে মনের মানুষের সন্ধান পেলে — যিনি অন্তরতম তাকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই যথার্থ অর্থে একাকিত্বের হাত থেকে মুক্তি মিলবে আর সেজন্য জপ ধ্যান সাধনা একান্ত প্রয়োজন। নামজপ হোক বা মন্ত্রজপ তার মধ্যে ডুবে যাওয়া দরকার গুরু নির্দেশিত পথে। এ জীবন শুধু দুদিনের খেলাঘর। চিরন্তনের আপনঘরে ফেরার জন্যে শেষ পারানির কড়ি সংগ্রহের ভবের হাট। তাই যেটুকু অবসর মিলবে তার মধ্যেই করে নিতে হবে সাধনার কাজ। নাহলে দিনের শেষে গাইতে হবে, "আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা।"

(১৬/৪/২০১৩)

সমালোচক

দিলীপকুমার রায় বলতেন — মানুষ যখন দেখে যে অপরের পিঠ চাপড়াতে না পারলে নিজের কপাল চাপড়াতে হবে তখনই তারা সমালোচক হয় । নগণ্যরা সবসময়েই চেষ্টা করে বরেণ্যদের ছোট করে দেখাতে। নিজে সে যা পারে না তা অন্য কেউ পারবে এটা তার সহ্য হয় না। যে দেশে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শুনতে হয়েছে "ঠাকুরবাড়ির রবি, সেও নাকি রে কবি" সে দেশে যুগে যুগে সাধু মনিষীদের যে হীন প্রমাণিত করার চেষ্টা হবে — সেটাই তো স্বাভাবিক।

এ পৃথিবীর সাধারণ মানুষজন হলো কাঁকড়ার মত। একজন উপরে উঠতে চাইলে বাকিরা তাকে টেনে নামাতে চায়। আজো সেই প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে দেখছি সমালোচনার নতুন চ্যানেল বেরিয়েছে। ইদানিং আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন

সাধু মনিষীরা। তাঁদের অপরাধ — তাঁদের জীবনে অলৌকিক ঘটে কিন্তু যুক্তিবাদী সমালোচকের জীবনে ঘটে না কেন? এক্ষেত্রেও আমি সবিনয়ে সমালোচকদের বলব — ক্লাস ওয়ান-এ পড়া শিশু যদি চায় এম. এ পাশের আনন্দ এখনই অনুভব করব তা কি হয়? আগে সাধনা করুন, জপ করুন, নিজেকে সেই সাধু মনিষীদের জায়গায় নিয়ে আসুন যেখানে এলে কৃপা অনুভব করা যায়, তারপর এসব রায় দেবেন। সমালোচনা করা সহজ, কঠিন সাধনা করা। সেটি না করে এমন বিশেষ অজ্ঞ হওয়াসত্ত্বেও বিশেষজ্ঞ সাজবেন না।

(১৭/৪/২০১৩)

প্রেম

কবি বলেছেন — "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে"। আমাদের চারপাশে সাধারণতঃ তিন প্রকারের প্রেম দেখা যায় — অধম প্রেম, মধ্যম প্রেম এবং উত্তম প্রেম। অধম প্রেমটিকে ঠিক প্রেম বলা যায়না — এটিকে আমার মতে shame বলা উচিত। এটি হল একরকমের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। তবে এটিই অধিকাংশ মানুষের মধ্যে দেখা যায় এবং এটিকে প্রেম বলে অভিহিত করাও হয় বলে একে অধম প্রেম বললাম। এখানে মানুষ দিতে নয়, চায় শুধু পেতে। মানে অধম প্রেমিক/প্রেমিকা সবসময়ে দেহী-দেহী করে। ভালবাসার বদলে শুধু অন্যের থেকে সে কিছু হাতিয়ে নিতে চায় আর যদি সেই সম্পর্ক কেটে যায় তবে বেরিয়ে যাবার আগে প্রেমিক/প্রেমিকার থেকে যতটা পারে শুষে নিয়ে যায়।

মধ্যম প্রেম হল দুজনের মধ্যে একটা চুক্তির মত — শান্তি চুক্তি। তুমিও ভালো থাক, আমিও ভালো থাকি — এমন একটা ভাব। সেইখানে আমি তোমায় এটা দিচ্ছি, তুমি আমায় ওটা দাও এরকম একটা মানসিকতা থাকে। অর্থাৎ কেউ কারোর ক্ষতি না করে একে অপরের দোষগুণ মিলিয়ে adjust করে চলা। আধুনিক সমাজে এই প্রেমেরও চল আছে ভালই। অধিকাংশ ভদ্র স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন প্রেমটাই দেখা যায়। এখানে দুজনে দুজনকে দিয়ে এবং দুজনের থেকে নিয়ে খুশী থাকে। এটিকে সাধারণভাবে ভদ্র প্রেম বলা যায়।

কিন্তু উত্তম প্রেম মেলে কোটিতে গোটিক। অর্থাৎ নিজেকে উজাড় করে অপরকে ভালবাসা। সেখানে প্রেমিক/প্রেমিকা কিছু চায় না। এমনকি প্রেমিক/প্রেমিকাকে না পেলেও তারা দুঃখিত হয়না কারণ প্রেমিক/প্রেমিকার সুখেই তারা সুখী হয়। শুধু ভালোবেসেই তারা সুখী ; প্রেমিক/প্রেমিকার সুখেই তাদের সুখ। একে পাশ্চাত্যে twin soul-ও বলে থাকে। এখানে প্রেমিক/প্রেমিকার নিজের বলে কিছু থাকে না। সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেয় প্রেমিক/প্রেমিকার কাছে। যেমন ভক্ত নিজেকে সঁপে দেয় ইষ্টের কাছে। এরকম প্রেমের উদাহরণ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কথা বলা যায়। ভালোবেসেই তাঁরা সার্থক। অপরের কাছ থেকে কি পাওয়া গেল কি গেল না তা নিয়ে তাঁরা ভাবেননি কখনো। তাইতো তাঁদের প্রেম চিরন্তন।

তাই প্রেম যদি করতেই হয় তবে উত্তম প্রেমকেই বেছে নেয়া ভালো। সেই প্রেমেই আছে যথার্থ সুখ। সেখানে "বিরহ মধুর হয় আনন্দসাগর উথলে।" যেখানে পাওয়ার আশা নেই, নেই প্রত্যাশা সেখানেই তো সার্থক প্রেম। সেই প্রেম হল "নিকষিত হেম" যা জন্ম জন্মান্তর ধরে বারবার প্রেমিক ও প্রেমিকাকে নানা রূপে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনে শুধু প্রেমের সুরভি উপভোগের জন্যে। তোমরা বলবে — শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা তো দ্বাপরে এসেছিলেন, তাঁরা আর ফিরে এলেন কোথায়?

আমি বলব — তাঁরা ফিরে ফিরে আসেন পৃথিবীতে আজো, আজো তাঁরা নিত্যলীলা করেন এই পৃথিবীতে। আর যেখানে দেখেন এই উত্তম প্রেমের পাত্র পাত্রীদের তাদেরও তাঁরা কৃপা করেন কারণ উত্তম প্রেম যে মানুষকে নিয়ে যায় দেবত্বের পথে। আর উত্তম প্রেমের মাঝেই যে আছে শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণের নিবাস।সেইতো ভাবজগতের গোলোক।

(১৮/৪/২০১৩)

প্রেমের আদর্শ পাত্র বা পাত্রী

গতকাল প্রেম সম্বন্ধে লেখার পর আমার কাছে অনেক বার্তা এসেছে — প্রেমের আদর্শ পাত্র বা পাত্রী কে হতে পারে তা নিয়ে লেখার জন্যে। আমি বলব — প্রেমের সত্যিকারের পাত্র বা পাত্রী করা উচিত আপন ইষ্টকে যদি তাঁকে মধুরভাবে সাধনা করতে চান। যেমন মীরাবাঈ তাঁর গিরিধর নাগরকে প্রেমিকরূপে ভজনা করেছিলেন। সেই তো যথার্থ প্রেম — জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম।

তবে সবার পক্ষে সেই ভাব নিয়ে ভালবাসা সম্ভব নয়। কারণ দেহভাবের উর্দ্ধে উঠতে না পারলে এভাবে ইষ্টকে প্রেমিকরূপে ভজনা করা যায় না। তাহলে সাধারণ মানুষদের জন্যে প্রেমের পক্ষে আদর্শ কারা হতে পারে? আমার মনে হয় — যারা সৎ, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে কিছু না চেয়ে শুধু ভালবাসারই জন্যে, যাদের অপরের কাছে কোনো দাবী নেই এবং যারা প্রেমিক/প্রেমিকার রূপ বা আর্থিক সঙ্গতির কথা মাথায় না রেখে নিস্বার্থভাবে ভালবাসে তারাই প্রেমের পদবাচ্য। তবে ভাববেন না যে মানুষকে ভালবাসা মানে যথার্থ ভালবাসা হল না। মানুষের মধ্যেই তো ঈশ্বরের বাস। তাই মানুষকে যথার্থ ভালবাসতে পারলেও প্রকারান্তরে ঈশ্বরকেই ভালবাসা হয়। শুধু ভালবাসার বদলে কিছু চাইবেন না। তাহলে ভালবাসা হয়ে যাবে পূজা আর পূজা কখনো ব্যর্থ হয়না জীবনে।

(১৯/৪/২০১৩)

আজকের যুগের শিক্ষা কি আদৌ শিক্ষা?

সময় যাচ্ছে। যুগ পাল্ট াচ্ছে আর তার সাথে তাল রেখে মানুষের মধ্যে বাড়ছে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রকোপ। মানুষ এখন আধুনিক হতে চায়। তাই স্বদেশের সংস্কৃতি ভুলে বিদেশের অন্ধ অনুকরণ করে। স্বদেশের ঠাকুর ভুলে বিদেশের কুকুর পূজা করে। বাঙালীর ছেলেমেয়েরা আজকাল বাবাকে daddy ডাকে, মাকে mummy, ইংলিশ ভাষায় গড়গড়িয়ে কথা বলে কিন্তু বাংলা বলতে বললে কাঁধ ঝাকিয়ে বলে, "You know, I dont understand Bengali" আর সেটাতেই তাদের সামাজিক prestige। এরা দেশী পোশাককে ঘৃণা করে, কারণ এসব সাধারণ "old fashioned" পোষাক বিদেশী পপস্টার দ্বারা অনুমোদিত নয়। এদের পড়াশোনা, কথাবার্তা, চালচলন সব তথাকথিত hi-fi, চাকরি করে বড় বড়, বাবা মা-রাও খুশী — ছেলেমেয়ে জীবনে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে এই খুশি অবশ্য বেশীদিন থাকে না কারণ তারপর সেই বাবা মায়ের যখন বয়স হয়, তখন এই দাঁড়িয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েরাই ঠিক পুরনো জামা ফেলে দেয়ার মত বাবা মাকে ছেড়ে দিয়ে আসে বৃদ্ধাশ্রমে। বর্তমান যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায় বলতে এদেরই আমরা বুঝি।

কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো — এরা কি আদৌ শিক্ষিত? যাদের মনে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নেই, বাবা মায়ের প্রতি ভক্তি নেই, মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান নেই, অর্থবান ছাড়া কারোর উপরে ভালবাসা নেই, দেশীয় পোশাকের প্রতি অবজ্ঞা ছাড়া কিছু নেই — এই তথাকথিত সম্প্রদায় কি আদৌ শিক্ষিত?

আমার তো মনে হয় — এদের থেকে সেই সহজ সরল কুলী মজুররাও বেশী শিক্ষিত যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে, যারা অর্থের অভাবে পড়াশোনা করে উঠতে পারেনি কিন্তু মনুষ্যত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত, যারা বাবা মাকে দেবতার মত মানে — নাইবা থাকল তাদের ডিগ্রী, কিন্তু আমার মতে তারা অনেক উঁচুদরের মানুষ।

যে শিক্ষা মানুষের মনকে উন্নত না করতে পারে, সেই শিক্ষা আদৌ শিক্ষা নয় — কুশিক্ষার নামান্তর। শিক্ষা তখনি শিক্ষা হয় যদি তা মানুষের মনের উত্তরণ ঘটায়। নাহলে শিক্ষার সূত্রে পাওয়া ডিগ্রী সব নিছক কাগজ ছাড়া কিছু নয়।

(২০/৪/২০১৩)

জপ

আমাদের জীবনে জপের কোনো বিকল্প নেই। সাধনপথে এগোতে হলে জপের প্রয়োজন অনঃস্বীকার্য। এই জপ হয় তিন প্রকারের — উচ্চৈস্বরে জপ, উপাংশু জপ ও মানস জপ।

এর মধ্যে প্রথমটি হল জপের মধ্যে সবচেয়ে নীচের স্তর। বীজমন্ত্র জপের ক্ষেত্রে এটা চলে না। শুধু নামজপে চলতে পারে। একদম প্রাথমিক স্তরের নামজপের ক্ষেত্রে এই উচ্চৈস্বরে জপ করতে দেয়া হয়। অর্থাৎ এটি হল একদম শুরুর স্তর।

দ্বিতীয় জপ অর্থাৎ উপাংশু জপ হল যেখানে জিভ ও ঠোঁট নড়বে মন্ত্র উচ্চারণের সাথে সাথে কিন্তু আওয়াজ হবে না, অর্থাৎ নীরবে জপ চলবে মনে মনে। যারা প্রথম বীজমন্ত্র পেয়েছে তাদের এই উপাংশু জপের কথা বলা হয়। এতে বীজমন্ত্র সশব্দে উচ্চারণ হয় না কিন্তু মনে মনে এবং জিভের মাধ্যমে চলতে থাকে। উপাংশু জপে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জপ করতে হয় একটা সংখ্যা মেনে যেমন ১০৮, ১০০৮ বা ১০,০০৮। শুরুর দিকে উপাংশু জপ আদর্শ। এতে মন স্থির হয়ে যায় একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জপ করার জন্য।

তবে শ্রেষ্ঠ জপ হলো মানস জপ যাকে বলে অজপা। শ্বাস প্রশ্বাসে এই জপ করতে হয়। শ্বাসের সাথে একবার, প্রশ্বাসের সাথে একবার। তাতেই হয়। যতক্ষণ ইচ্ছা কর না গুণে, মালা না জপে মনে মনে এই জপ করে যাওয়া যায়। উপাংশু জপে যখন জপের সময়টা সম্বন্ধে মস্তিষ্ক অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখনই এই জপে আসা ভালো। এই জপে কোনো কর গোণার বা মালা জপের বা সংখ্যা গোণার প্রয়োজন থাকেনা। শুধু মনপ্রাণ দিয়ে জপ করে গেলেই হল। সব সাধকরাই বলেন — এটিই হল উত্তম জপ।

নিত্য এই জপের মধ্যে থাকলে মানবের উত্তরণ হবেই। তবে জপের সময়ে "আমার ওই কাজটা করতে হবে", "ও আমাকে এরকম কেন বলল" বা "আমাকেও এর বদলা নিতে ওই বলতে হবে" এসব কোন চিন্তা মনে রাখা চলবে না। এসব চিন্তা মনে শুরুর দিকে আসবে ঠিকই। তবে সেইসময়ে ধ্যান করে এটা কমাতে হবে। মনটা তখন শুধু রাখতে হবে শ্বাস নেয়া ও শ্বাস ছাড়ার দিকে। তাতেই ধীরে ধীরে মনের চিন্তার উপর নিয়ন্ত্রণ আসবে আর তখনই শুরু করতে হবে জপ। মনকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করে জপ করে যেতে হবে। এতেই পাওয়া যায় জপের

যথাযথ ফল। আপনাদের সবার জপ এভাবে সার্থক হোক — এই কামনাই করি।

(২১/৪/২০১৩)

নিবৃত্তির পথেই শান্তি

মানুষ প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তি তাকে যেভাবে চালিত করে, সে সেভাবেই এগোয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছেন প্রবৃত্তির মধ্যে থেকেও নিবৃত্তিতে পৌঁছনো যায় অর্থাৎ সংসারে থেকেও আসক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে হৃদয়ে। আমরা ভাবি আসক্তি হল শক্তি আর অনাসক্তি হল দুর্বলতা। কিন্তু ভাবনাটা ভুল। আমাদের দুর্বলতা হল আসক্তি আর তার জন্যেই আমাদের যত কষ্ট। আমার কাছে যে ভক্তরা আসেন অধিকাংশই জাগতিক জীবনে আঘাত পেয়ে আসেন। অর্থাৎ সেই আসক্তির দ্বারা আহত। একে জয় করার একমাত্র উপায় নিবৃত্তি। তার মানে কি সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে হিমালয়ের গুহায় বসে থাকা? তা নয়। সংসারে থেকেও নিবৃত্তিসাধন সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ তো ঘোরতর সংসারী ছিলেন বহিরঙ্গের দিক থেকে কিন্তু অন্তরঙ্গে তিনি ছিলেন মহাযোগী — ১৬,০০০ স্ত্রী নিয়েও তিনি ছিলেন নিস্পৃহ। সংসারে থেকেও সংসারের উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। অনাসক্তি ছিল তাঁর শক্তি। একই কথা শ্যামাচরণ লাহিড়ির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ আমরা এই জাগতিক জীবনের মাঝেই থাকব। ঠাকুর আমাদের যে কাজ দিয়েছেন তাই করব কিন্তু কোন আসক্তিতে জড়াব না। সব কর্তব্য করব কিন্তু নিস্পৃহভাবে ফলের জন্য আশা না করে। তবেই তো আসবে যথার্থ শান্তি। তাই সংসারে প্রবৃত্তি আমাদের বাঁধতে চাইলেও তার মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হবে নিবৃত্তিতে। তবেই আসবে শান্তি। তখনই মানুষ পৌঁছবে ঈশ্বরের স্তরে।

অনেকে হয়তো বলবেন — আজকাল তো দিকে দিকে সাধুরা ভগবান হয়ে বসছেন। এরা কি সবাই পৌঁছতে পেরেছেন ঈশ্বরের জায়গায়? আমি বলব — না, সবাই পারেননি ঠিকই। তবে সবাই পারেননি বলে সবাইই যে ব্যর্থ এমনও ভেবে নেয়ার কারণ নেই। শুধু যিনি যথার্থ তাঁকে চিনে নিতে হবে।

তাঁকে চেনার চিহ্নও আছে — যিনি ঈশ্বরের জায়গায় বা উচ্চকোটিতে পৌঁছতে পেরেছেন তাঁর মধ্যে থাকবে তিনটি চিহ্ন — অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেমরস

আর অনন্ত আনন্দ। অর্থাৎ —

(১) আধ্যাত্মিক বিষয়ে থাকবে তাঁর বিরাট জ্ঞান যা মানুষকে সাহায্য করবে তার প্রশ্নের উত্তর পেতে।

(২) তাঁর মধ্যে থাকবে মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার শক্তি যা তাদের সকল দুঃখ আর না পাওয়ার যন্ত্রণা ভুলিয়ে ঈশ্বরমুখী করে তুলবে।

(৩) আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি হবেন পরম আনন্দময় — তাঁর সাথে কথা বললে বা তাঁর কথা শুনলে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হবে আনন্দ।

যে মানুষের কাছে গেলে এই তিনটির আস্বাদ পাবেন বুঝতে হবে তিনিই ঈশ্বরের কাছে যেতে পেরেছেন বা ঈশ্বরকোটিতে উঠতে পেরেছেন। তখন তাঁকেই ধরে থাকতে হবে।

এঁরাই হল ঠাকুরের ভাষায় সেই গাদাবোট যারা বাকি সব বোটদের টেনে নিয়ে যান উত্তরণের পথে।

(২২/৪/২০১৩)

পরনিন্দা পরচর্চা

মানুষকে সম্মান দেয়ার চেয়ে বড় গুণ হয় না। ছেলেবেলায় আমি শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম। তিনি এতই মাটির মানুষ ছিলেন যে যে ব্যক্তিই তাঁর সামনে আসত তাকেই তিনি প্রণাম করতেন। আসলে তিনি সকল জীবের ভিতরে বসে থাকা ইশ্বরকে সম্মান দিতেন। (কোনো কোনো মানুষ অবশ্য সে সময়ে সেই অবস্থার ছবি তুলে নিজের publicityতে কাজে লাগিয়েছেন বলে শোনা যায়।)

অথচ আজকাল আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যেই রয়েছে একের অপরকে ছোট প্রমাণ করার একটা প্রচেষ্টা। মানুষ যে জগতের কাছে ছুটে আসছে শান্তির জন্যে সেই জগতের মানুষরাই অন্য গুরু বা সাধকের নামে কাদা ছোটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে ফল হয় অন্য — তাদের প্রতি জনমানসে যে শ্রদ্ধার জায়গা তৈরী হয়েছে সেটা নষ্ট হয়ে যায়।

আমার কাছেও অনেক মানুষ এসে অন্য গুরুর বা অন্য আধ্যাত্মিক লেখকের

নামে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমি বলতে দিইনি। কথা শুরু করতে না করতেই থামিয়ে দিয়েছি। কারণ পরনিন্দা পরচর্চা আধ্যাত্মিক জগতের মানুষদের শোভা পায় না।

সেদিন শুনছিলাম একজন সমসাময়িক আধ্যাত্মিক বই-এর লেখক আমার বই সম্বন্ধে নানা বাজে কথা বলছেন তাঁর পরিচিতদের কাছে। শুনে প্রথমে হাসলাম — নর্মদা নিয়ে যাঁর চর্চা করার কথা তিনি যে দুটি শব্দ এদিক-ওদিক করে নর্দমা ঘাঁটতে ব্যস্ত। আধ্যাত্মিক বই লিখলেই তো অধ্যাত্মমনস্ক হওয়া যায় না — সেটা মনেপ্রাণে মানতেও হয়। আর পরনিন্দা পরচর্চা জয় করতে না পারা মানে তো সাধনার প্রথম ধাপেই আটকে যাওয়া। নাও। বর্তমানটুকুই ঠাকুর তোমার হাতে দিয়েছেন। তাই শুধু তাঁকে নিয়ে থাকলেই চারপাশের চাপ ও যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠতে পারবে। আবেগের যন্ত্রণাও সইতে হবে কম।

নিজেকে বর্তমানে নিয়ন্ত্রিতভাবে রাখার একটি সরল উপায় বলছি। সুখাসনে বসে তারপর ভাবলাম — যাক নির্ঘাৎ আগের জন্মে আমি ওনার কোনো উপকার করেছিলাম। তাই এ জন্মে উনি আমার ধোপার কাজ করছেন মিথ্যে সমালোচনার মাধ্যমে আমার প্রারব্ধ টেনে নিয়ে। তাই ওনাকে দূর থেকেই নমস্কার জানিয়ে প্রার্থনা করেছি — উনি যেন আরো অনেকদিন বেঁচে থাকেন এবং আরো অনেকদিন ধরে এভাবেই আমার ভুলভাল সমালোচনা করেন যাতে আমার প্রারব্ধক্ষয় আরো দ্রুত হয়। তবে আমি ওনার পাপ নিতে রাজি নই। তাই ভুলেও ওনার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করব না।

আমি জীবনের উষাবেলায় ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের কাছে যা শিখেছি সেটাই অনুসরণ করব জীবনভর। সম্মান সবাইকেই দেব — সে যে আমায় যতই কলসীর কানা মারুক। কারণ ঠাকুর সব দেখছেন — দিনের শেষে বিচার তো তিনিই করবেন।

(২৩/৪/২০১৩)

আমি কে?

যদি তোমাদের প্রশ্ন করা হয় — কে তুমি? কি হবে তার উত্তর?

আমরা সাধারণতঃ এক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক পরিচয়টাই বলি — যেটা সমাজ দ্বারা স্বীকৃত। এককথায়, এখানে আমি বলতে বোঝানো হচ্ছে আমাদের সামাজিক পরিচয়। আর সেটা দিয়েই সমাজে বসবাসের যাবতীয় কাজ আমাদের করতে হয়। অর্থাৎ জন্মের পর বাবা মা যে নাম দিয়েছেন আমায়, সেটা সমাজ কর্তৃক রেজিস্টার্ড হবার পর সেটাই হল আমার পরিচয়। ব্যাঙ্কে যখন টাকা রাখলাম তখন আমার সই হল আমার পরিচয়। সেটা মিললে আমি টাকা তুলতে পারব বা অন্যকে দিতে পারব, নাহলে নয়। অর্থাৎ সমাজ আমাদের যে পরিচয়ের উপর শীলমোহর মেরে দিয়েছে সেটাই আমি। কিন্তু ভেবে দেখ তো — এই পরিচয় কতদূর পর্যন্ত সত্যি? এখানে আমার ইচ্ছায় কি কিছু চলে? চলে না। সমাজের ইচ্ছায় আমি চলি। আমি স্বেচ্ছায় ততটুকুই করতে পারি যতটুকু সমাজ আমাকে অনুমতি দেবে। এতো গেল সমাজের কথা। আমার নিজের দেহের উপরই কি আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে? আমার যদি শরীর খারাপ হয় আর আমি যদি বলি — এই শরীর ঠিক হয়ে যা। তা কি হয়? হয় না। সেটা ঠিক করতে হলে চাই ডাক্তারের সাহায্য। আমার আয়ু যদি শেষ হয়ে যায় এবং আমি যদি আরো বাঁচতে চাই, সেটা কি হবে? হবে না। কারণ দেহের সময় ফুরালেই দেহ যাবে শ্মশানে। তবে আমি কি? স্থূলভাবে বলতে হলে, এই 'আমি' হল বাবা মায়ের দেয়া দেহ আর সমাজের দেয়া পরিচয়ের সঙ্গম। আমরা এই নিয়ে এত গর্ব করি। এই দেহের সুখের জন্যে এত খাটাখাটনি করি। অর্থ রোজগার ও সঞ্চয়ের জন্যে এত আমাদের ভাবনা। তার নীটফল কি? একটি বিরাট শূন্য। তাহলে কি সমাজের দেয়া এই পরিচয়টাই 'আমি' যার অস্তিত্ব দুদিনের? এই সামাজিক 'আমি' কি তবে প্রকৃত আমি? না। এই পরিচয়টা শুধু সমাজের জন্যেই প্রয়োজন। এখানে বাস করার জন্যে। এটিকেই বলে 'ইগো'। আর প্রায় সব মানুষ এই ইগোকেই 'আমি' ভেবে নিয়ে জীবনভর ভুল কাজ করে যায়। কিন্তু আসল কথা হল — এই সামাজিক আমি শুধু একটা বহিরঙ্গের জামা ছাড়া কিছু নয়। আমরা নিজের বদলে এই জামাটিকে নিয়েই মেতে থাকি আর তারই ফলে আমাদের আসল কাজ বারবার বাকি থেকে যায়। ফলে ফিরেও আসতে হয় বারবার।

তাহলে আমার পরিচয় কি? সাধু মহাত্মাদের কাছে তাদের পরিচয় জানতে

চাইলে তারা বলেন "আমি আনন্দস্বরূপ" বা "আমি আলোর পথের পথিক"। একই কথা আমাদের ক্ষেত্রেও খাটে। সেই আলোর পথে অগ্রসর হবার জন্যেই আমাদের পৃথিবীতে আসা। কিন্তু সেই পথে চলার জন্যে তো একটা জামা পরে নিতে হয় — রক্তমাংসের জামা। সেটিই হল এই শরীর। আর সেটাকে মাধ্যম করেই আমাদের সাধনার পথে অগ্রসর হতে হয়। আমাদের সামাজিক পরিচয় দুদিনের। আজ লোকে মাথায় করে রাখছে বা পায়ে ঠেলে দিচ্ছে কিন্তু কাল তাদের আমার কথা মনেও পড়বে না। এই পরিচয় যে দেহটিকে কেন্দ্র করে সেটিও চিরদিন থাকবে না। তবে কেন শুধু এটি নিয়েই মেতে থাকব? কেন যে কাজের জন্যে এসেছি সেটায় সময় দেব না? আমাদের মূল কাজ তো ইশ্বরত্ব অর্জন নিজের কর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের লীলা উপভোগ করতে করতে। সেই কাজটিকে একপাশে সরিয়ে রেখে কেন এই ইগোকে ভালোবেসেই কাটিয়ে দেব জীবন? আমাদের যে সময় বড় কম। বেলা যে বয়ে যায়। তবে কেন নিজের আসল পরিচয় ভুলে নিজের আসল কাজকে অবহেলা করে সামাজিক পরিচয়টুকুকে সার করেই দিনগুলি কাটিয়ে দেব?

(২৪/৪/২০১৩)

গুরু

গুরু শব্দের অর্থ কি? গুরু শব্দ ভাগ করলে দেখা যাবে — 'গু' আর 'রু'। এর মধ্যে 'গু' শব্দের অর্থ — অজ্ঞানের অন্ধকার যার মধ্যে জীবজগত নিমজ্জমান। আর 'রু' শব্দের অর্থ হল জ্ঞানের আলো যা আমাদের অজ্ঞানের জগত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় জ্ঞানের আলোর জগতে। অর্থাৎ — গুরু হলেন সেই ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদের ভিতরকার অজ্ঞানের অন্ধকার নাশ করে মন্ত্রের সাহায্যে আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করে এগিয়ে দেন মহাজীবনের পথে। জীবনমৃত্যুর বন্ধন থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে গুরু বিনা গতি নেই।

জীবনের যেকোন দিকে এগোতে হলেই প্রয়োজন হয় একজন পথপ্রদর্শক বা গাইড যিনি সেই পথ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানেন। যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক

তেমনই আধ্যাত্মিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরু। যেমন অন্ধের রাজ্যে যে দেখতে পায় সেই হয় রাজা তেমনই আধ্যাত্মিক পথেও যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিজের অভিজ্ঞতা, সাধনশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও ভালবাসা দিয়ে সবাইকে পথের দিশা দেখাতে পারেন তিনিই হলেন যথার্থ গুরু।

আজকালকার দিনে বেশিরভাগই দেখা যায় গুরুতে গুরুতে রেষারেষি — সেই অনুযায়ী শিষ্যরাও 'আমার গুরুই শ্রেষ্ঠ' এমন একটা ভাব নিয়ে ঝগড়া চালিয়ে যায়। কিন্তু ঘটনা হল — গুরু কিন্তু আদতে কোনো ব্যক্তি নয় ; গুরু হল মহাদেবের শক্তি। সেই শিবশক্তি প্রতিটি মানুষের মধ্যে থেকে তাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু মুশকিল হল — ভিতরের সেই গুরু থাকেন সুপ্ত অবস্থায়। তাঁকে জাগাতে হয়। আর সেজন্যেই প্রয়োজন হয় মানব দেহধারী একজন গুরুকে।

সেই গুরু হলেন অনেকটা চাঁদের মত যিনি সাধনার মাধ্যমে নিজে পৌঁছতে পেরেছেন সেই আলোকিত স্তরে যেখানে ইষ্টকৃপা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে শিষ্যকে আলোকিত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আলোর পথে। তাই শিষ্যের উত্তরণ গুরুর মাধ্যমে হলেও সেটি কিন্তু তিনি ঘটান না ; তাঁর শিষ্যের প্রতি ভালবাসা, স্নেহ ও কৃপা এবং শিষ্যের অধ্যবসায় ও গুরুভক্তি দেখে ইষ্ট কৃপা করেন। এমনকি, অনেকসময়ে গুরুর রূপ ধরেই ইষ্ট শিষ্যের কল্যাণ করেন — এমন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। তাই সকল গুরুর শক্তিই সেই এক — মহাদেবের শক্তি। মহাদেবই আসল গুরু — বাকিরা সবাই তাঁর প্রতিনিধি। তবে ইষ্টের প্রতিনিধি বলেই শিষ্যের কাছে ইষ্টের সমতুল্য হলেন গুরু।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে — গুরু হবার qualification কি? যে কেউ কি গুরু হতে পারেন? না। গুরু তাঁরাই হতে পারেন যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সাধনা করেছেন, ইষ্টের কৃপা পেয়েছেন এবং যাঁদের মধ্যে আমিত্বের নাশ হয়েছে। গুরুর কোন ধর্ম বা সংকীর্ণতায় নিজেকে আবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। যার মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান রয়েছে তাকেই কৃপা করা উচিত। শিষ্য ভক্তদের প্রতি তাঁর প্রেম ও ভালবাসা হওয়া উচিত নিঃস্বার্থ। তাঁর হওয়া উচিত অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান আর অনন্ত আনন্দের সঙ্গম।

আজকের দুনিয়ায় গুরু আছেন দুরকম — সদগুরু (যাঁরা সংখ্যায় কম) এবং বদ্‌গুরু (যাঁরা সংখ্যায় বেশী) ; এর মধ্যে সদ্‌গুরুদের কথা তো বললাম। এবার আসি বদ্‌গুরুদের কথায় ; কিভাবে তাদের চিনবে!

১) বদ্‌গুরুরা সবসময়ে দেখান যে শিষ্যরা নগণ্য এবং একমাত্র তাঁর মহত্বের কৃপাতেই শিষ্যদের উন্নতি সম্ভব। অর্থাৎ এঁদের মধ্যে আমিত্বের ভাব প্রবল থাকে।

২) এঁদের মধ্যে সম্পদ ও নারীদের প্রতি দৈহিক আকর্ষণ থাকে বেশী।

৩) এঁরা যশখ্যাতির কাঙ্গাল হন এবং সবকিছুতেই নিজের ক্রেডিট নিতে চান।

৪) এঁরা কখনো নিজেকে উজাড় করে শিষ্যকে শেখান না। এঁদের ভয় থাকে — সব শিখিয়ে দিলে তাঁর গুরুত্ব কমে যেতে পারে।

তাই গুরু না পাওয়া পর্যন্ত 'গুরু-গুরু' করে ছটফট করা ঠিক নয়। এতে বদ্‌গুরুদের কাছে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সময় হলে গুরু আপনিই আসেন জীবনে বা শিষ্য গিয়ে পরে তাঁর কাছে। আর তখন শিষ্যর মনে যেমন ধরা দেয় ভাব যে ইনিই আমার গুরু তেমনি গুরুও শিষ্যকে দেখেই চিনতে পারেন। তখনই হয় যথার্থ দীক্ষা। সেই সময় না আসা পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের ধৈর্য্য ধরে নিজের পছন্দমত দেবদেবীর নাম জপ করে যেতে হয় যাতে তার ভিতরে দীক্ষালাভের গুণগুলো জেগে ওঠে। একমাত্র তবেই তো জীবনে আসেন গুরু এবং তারপর তাঁর কথা মেনে চললে সার্থক হয় জীবন।

(২৫/৪/২০১৩)

সম্পর্কের আসা-যাওয়া

আমরা কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসিনি উপর থেকে, কিছুই সাথে নিয়ে যাবও না। যা এখান থেকে নিয়েছি তা সব এখানেই রেখে যাব। আমাদের সঙ্গী শুধু থাকবে আমাদের কর্ম। তবু আমরা জড়িয়ে যাই নানা সম্পর্কের জালে। আর কোন সম্পর্ক কেটে গেলেই উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ি। বিশেষতঃ তা যদি প্রেমের সম্পর্ক হয় তবে তো কথাই নেই। কেউ কেউ তো আবার আত্মহত্যাও করে কোন ছেলেকে বা মেয়েকে জীবনে না পেলে। আমাদের সমাজে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন।

কিন্তু আমি সেইসব ছেলেমেয়েদের বলব — একজনকে পেলে না বলে কেন জীবন শেষ করে দেয়ার কথা ভাববে? জীবন তো তোমার অনেক বিশাল। তার যথোপযুক্ত ব্যবহার কর। জীবন শেষ করে দেয়া মানে তো জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া। যাকে চেয়েছ তাকেই যে পেতে হবে এমন তো কোনো মানে নেই। তোমার উপরে নীল আকাশের আসনে যিনি বসে আছেন তিনি তোমার সব খবর রাখছেন আর তোমার জন্যে যেটা সবচেয়ে ভালো হবে তার ব্যবস্থাও

তিনি করবেন। তাঁর উপর ভরসা রাখ আর জীবনপথে এগিয়ে যাও।

জানবে — প্রতিটি সম্পর্ক চলে আগের জন্মের ঋণানুবন্ধ অনুযায়ী। যার থেকে যতটুকু তোমার পাওয়ার ততটুকুই পাবে। তারপর সে হারিয়ে যাবে তোমার জীবন থেকে। কাউকে নিজের ইচ্ছায় তুমি কখনোই ধরে রাখতে পারবে না।

ঋণজ ফুরোলেই সব ভোকাট্টা। তাই আজকে যাকে ছাড়া তোমার চলবে না ভাবছ কালকে দেখবে সে তোমার চিন্তাতেও স্থান পাবে না। এই মায়ার জগতের এটাই নিয়ম। কিন্তু কালকের জন্যে অপেক্ষা তো করতে হবে তোমায়। নাহলে সেই দিনটা দেখবে কিভাবে?

তাই নিজে থেকে কোন সম্পর্ক নষ্ট করবে না। কারণ ভালবাসার সম্পর্ক মেলে বহু ভাগ্যের ফলে। সকল সম্পর্কের জন্যেই তোমার কর্তব্য করবে কিন্তু কোন সম্পর্কের মায়াতেই জড়াবে না। তাহলে দেখবে এই সম্পর্কের ঢেউ-এর আসা যাওয়া তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

সব ছেড়ে দাও ঠাকুরের উপর। যাকে তিনি আনবেন তাকে বরণ করে নাও আর যাকে তিনি ছিনিয়ে নেবেন তোমার কাছ থেকে তাকে সানন্দে বিদায় দাও। জোর করে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা যায় না আর সেটা না টিকলেই যে সব গেল এমন ভাবনাকেও মনে স্থান দিও না। অবিদ্যা মায়ার এটাই খেলা। আজ আসবে, কাল যাবে। কিন্তু তা নিয়ে কখনো ভাববে না। ঈশ্বর যাই দেবেন তা বরণ করে নেবে হাসিমুখে — তবেই দেখবে দুঃখ রূপান্তরিত হবে সুখে পরমানন্দভরে।

(২৭/৪/২০১৩)

প্রাণায়াম

পাশ্চাত্যে বলা হয় — মন আর দেহ প্রত্যক্ষভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত। মন খারাপ হলে তার প্রভাব পড়ে দেহে আর দেহ খারাপ হলে তার প্রভাব পড়ে মনে। পাশ্চাত্যে এই মন বলতে বোঝানো হয় নিম্নস্তরের মন বা lower mind। এটি চিন্তা, আবেগ এবং কল্পনার স্তরে পড়ে।

কিন্তু ভারতবর্ষে বলা হয় — দেহ মনের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত। প্রাণের সেতু বেঁধে রাখে মন আর দেহকে। দেহকে যদি শান্ত ধীরস্থিরভাবে বসানো যায় তবে প্রাণও তার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে। আর প্রাণ সেই জায়গায় এলে মনকেও ধীরে ধীরে সেই শান্ত অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব। অতএব যৌগিক উপায়ে প্রাণায়ামের উদ্ভব।

এই প্রাণ কিন্তু শ্বাস নয়। শ্বাস হল দেহের ক্রিয়াকর্মকে সচল রাখার মুখ্য শক্তি। এই শক্তির মাধ্যমেই গতিশীল হয় মন। অতএব এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই মনকেও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। তাই প্রথমে প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় আর এই প্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় প্রাণায়ামের মাধ্যমে। তাহলে আপনা থেকেই মনের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

আমাদের উদ্দেশ্য থাকে শরীরের ভিতর থেকে তমোগুণ আর রজগুণকে বের করে দিয়ে তার মধ্যে সত্বগুণের প্রকাশ ঘটানো। প্রাণায়াম আমাদের সেদিকেই এগিয়ে নিয়ে যায়। ফলে দেহের ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন অনাবিল হয়ে ওঠে তেমনি মন হয়ে ওঠে বিশুদ্ধ। আমাদের মন জাগতিক জগতের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকার ফলে যে সত্বগুণকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিত না তার শক্তি নাশ হয়ে যায় এবং মন হয়ে ওঠে সাত্ত্বিক। একমাত্র এই অবস্থাতেই সাধনপথে এগোনো সম্ভব হয়।

(২৮/৪/২০১৩)

গুরু যদি বদগুরু হয়, শিষ্যের কি দশা হয়?

অনেকেই আমার কাছে প্রশ্ন করেন, "গুরু যদি সদগুরু না হয় তবে শিষ্যের কি দশা হয়?

উত্তরে আমি বলি, "শিষ্যের দশা যে এতে খুব ভালো হয় এমন নয়। কারণ সিদ্ধ বীজমন্ত্র না পেলে সিদ্ধি হয় না। আর সিদ্ধ বীজমন্ত্র সবাই দিতে পারেন না।"

অনেকে হয়তো বলবেন, "আজকাল তো বীজমন্ত্র ইন্টারনেট খুঁজলেও পাওয়া যায়। তবে গুরুর প্রয়োজন কি?"

উত্তরে বলতে হবে, "দীক্ষার সময়ে সিদ্ধ বীজমন্ত্রটিকে গুরু আপন সাধনশক্তি দিয়ে সক্রিয় করে দেন আর তারপরই সেই মন্ত্র শিষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের দিকে।"

অনেকে হয়ত এও বলবেন, "গুরু যে সত্যই বীজমন্ত্রকে সক্রিয় করে দিয়েছেন আপন সাধনশক্তি দিয়ে তার প্রমাণ কি?"

আমি বলব, "প্রমাণ তথা একমাত্র সাক্ষী হচ্ছে শিষ্য। সে যত জপের গভীরে ঢুকবে তত সে নানা দিব্য অনুভূতি লাভ করবে এবং পরিশেষে পাবে ইষ্টের দর্শন। তবে দর্শন তো অনেক পরের কথা। কিন্তু ঠিকভাবে জপ করলে যে আনন্দময় অনুভূতি জাগে মনে সেটিই হল গুরুর মন্ত্রকে সক্রিয় করে দেয়ার প্রমাণ।"

এবার আবার ফিরে আসি মূল প্রসঙ্গে — গুরু যদি বদগুরু হয় তবে শিষ্যের কি দশা হয়। সেটি যে খুব ভালো হয় না তাতো বলাই বাহুল্য। তবে খুব ক্ষতিও হয় না। শিষ্যের সিদ্ধি লাভ অবশ্যই এই মন্ত্রে হয় না। তবে প্রারব্ধ ক্ষয় হয় আর সেই প্রারব্ধক্ষয় তাকে এগিয়েই নিয়ে যায়। যথাসময়ে প্রারব্ধ শেষ হলে সে পায় তার জন্যে নির্দিষ্ট সদগুরুর দেখা। কারণ সে যে গুরুর উপর বিশ্বাস করে ইষ্টের মন্ত্র বা নাম জপ করেছে। আর বিশ্বাসের মূল্য তো ঠাকুর ঠিকই দেন।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি — একবার এক শিষ্য আর এক গুরু হিমালয়ের এক পর্বত থেকে আরেক পর্বতে যাবে। নীচে দুর্দান্ত বেগে বইছে খরস্রোতা নদী। মাঝে দড়ির সেতু। শিষ্য জয়গুরু বলে এগিয়ে গেল এবং নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেল সেতু। কিন্তু গুরু দড়ির সেতুর সামনে এসে ভাবল — কি জানি যদি পড়ে যাই। অর্থাৎ কিনা তার বিশ্বাস আসেনি যদিও মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করেছে সে। এর ফল

হল— যেই গুরু সেতুতে পা রাখল সেতু ছিঁড়ে পড়ল নদীতে। সেইসাথে গুরুর ঘটল পঞ্চ ত্বপ্রাপ্তি। কিন্তু শিষ্য সেই গুরুর উপর বিশ্বাস রেখেই তরিয়ে গেল। এর থেকেই তো বোঝা যায় যে বিশ্বাসই হল আসল বস্তু। যার বিশ্বাস তারই লাভ। এই বিশ্বাসের মূল্য সবসময়েই মেলে। তাই বদগুরু পেলেও বিমর্ষ হবার কারণ নেই। তার মন্ত্র সিদ্ধি দিতে না পারলেও প্রারব্ধভোগ কাটাতে সাহায্য ঠিকই করে। অর্থাৎ অজান্তে ভুলের জন্যে আধ্যাত্মিক জগৎ সাজা দেয় না। এই জগৎ মানুষকে শুধু দু হাত ভরে দেয়। আমাদের শুধু কুড়িয়ে নেয়ার অপেক্ষা।

(২৯/৪/২০১৩)

আজ আছি কাল নেই

আমাদের জীবনের মূল সত্য — আজ আছি কাল নেই। তবু কাল-কের কথা ভেবেই আমরা ছুটি, আজ-কে ভুলে যাই। এর ফলেই আসে যত অশান্তি। ফলে জীবনের আনন্দ আমরা উপভোগ করতে পারি না। আমরা যে আগামীকালকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তাই যে কাল আসবে কি আসবে না তার ঠিক নেই তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আজকের মুহূর্তগুলো বেরিয়ে যায় আমাদের হাত থেকে। কিন্তু জীবনের আসল তো এই আজকের মুহূর্তটুকু। এর মধ্যে আমরা জীবনের কেমন রূপ দেখতে পারলাম, তাকে কেমনভাবে ভালো কাজে লাগাতে পারলাম — তার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। জীবনে বাঁচতে হয় প্রতিটি মুহূর্তে — প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগতে হয়। প্রতিটি মুহূর্তে যত নাম বা যত জপ আমরা করতে পারব সেটিই হল জীবন থেকে আমাদের আসল সঞ্চয়। তাই কালকের কথা না ভেবে জীবনকে প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব কর আর তার মাঝেই বাঁচার মত বাঁচার চেষ্টা কর। তাতেই জীবন পাবে সার্থকতার দিশা।

(৩০/৪/২০১৩)

প্যাঁচা হয়ে বাঁচা দায়

আমাদের সমাজে হুতোমের বড় সংখ্যাধিক্য। অনেকেই মনে করেন — সব জায়গায় গুরুগম্ভীর থাকতে পারার মাঝেই সম্মান। কিন্তু সবিনয়ে বলি — ধারণাটা ভুল। জীবন দুদিনের। প্যাঁচা হয়ে এখানে বাঁচা দায়। আর কেনই বা প্যাঁচা হতে যাবে? এই জীবনে ভালোভাবে বাঁচার শ্রেষ্ঠ উপায় রসেবশে বাঁচা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাই বলেননি? অতএব মনের মধ্য থেকে সকল মেঘ দূর করে দাও। মুখের উপর থেকে গাম্ভীর্যের মুখোশটা খুলে ফেল। মনের সুপ্ত অনুভূতিকে অনুভব করার চেষ্টা কর। প্রকৃতির মাঝে নিজেকে মেলে ধর। ঘাসে ভরা মাঠে শুয়ে একবার নীল আকাশটাকে দেখ। দেখতে পাবে — প্রকৃতি হাসিতে খুশিতে ঝিলমিল করছে। আর এই সকল রূপের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর রয়েছেন আনন্দে। এই আনন্দই তো আমাদের স্বরূপ। তবে কেন বহিরঙ্গের কাজের চাপে নিজেকে লুকিয়ে রাখা খোলের ভিতর? নিজে হাসো। সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোল। খুশীতে ভরিয়ে দাও সবাইকে। দেখবে সবার খুশীতে ভরা মুখগুলিই তোমাকেও ভরিয়ে দেবে আনন্দে। তখনি তো বুঝবে — বাঁচা কাকে বলে? আধ্যাত্মিক পথেও আনন্দে থাকার প্রয়োজন। যদি একবার মাথায় ঢোকে যে "আমি জ্ঞানী" ব্যাস তবেই গেল। আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে। তার চেয়ে রসেবশে থাকবে ছোট্ট শিশুর মত। সবাইকে ভালবাসবে। অন্য সবাইকে আনন্দে ভরিয়ে রাখবে। এই ভাব অবলম্বন করেই মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। তখন দেখবে — যে আনন্দের অনুভূতি তোমার মধ্যে জাগছে তা আর তোমাকে হুতোম হতে দেবে না। সেই যে প্রকৃত আনন্দ।

(১/৫/২০১৩)

নিজের ভাবনা নিজে ভাবো

আমরা মানুষরা কি দিন দিন যন্ত্র হয়ে যাচ্ছি? একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে — আমরা নিজেদের জন্যে সঠিকভাবে ভাবি না। তাই বলে কি আমরা ভাবনার ঊর্ধ্বে চলে গেছি? তাও নয়। ভাবনা আমাদের মনেই আছে কিন্তু সেটি আমরা ভাবি না।

আমাদের হয়ে আমাদের ভাবনা ভাবায় টেলিভিশন। প্রায় প্রতিটি ঘরেই দেখা যায় টেলিভিশনে যত অবাস্তব, ষড়যন্ত্রমূলক সিরিয়ালের ভিড়। প্রকৃত অর্থে এগুলিই serial killer। বাড়ির প্রায় সবাই সিরিয়ালের সময়ে উদ্বিগ্নভাবে টিভির সামনে।

আগেকার দিনে বাড়ির মেয়েদের যদি বলা হত — সন্ধ্যায় কি করতে হবে? সবাই একবাক্যে জবাব দিত — ঠাকুরকে সন্ধ্যা দিতে হবে। আর এখন? সন্ধ্যা হলে আজ এই সিরিয়াল দেখতে হবে। কোন সিরিয়ালে কোন ভিলেন আজ কি করতে পারে তাই নিয়ে সারাদিন টেনশন গেছে। অতএব সেটা দেখতে হবে। অর্থাৎ — আমাদের ভাবাচ্ছে সিরিয়াল।

এতে লাভ কি হচ্ছে — নানা হিংস্র ঘটনার মাকড়সার জাল আমাদের সুস্থ মাথায় বুনে দিচ্ছে টেলিভিশন। শুধু তাই নয় — এই টেলিভিশন থেকে আমাদের নবীন প্রজন্মের অবক্ষয়ের বীজও বোনার কাজ চলছে। বেশি টি. আর. পি পাওয়ার জন্যে তাতে নায়ক নায়িকারা ফ্যাশনের নামে যেসব কুরুচিকর পোশাক পরছে তাই নিয়েই নবীন প্রজন্ম উচ্ছ্বসিত এবং তারাও একেই অনুসরণ করছে। অর্থাৎ নিজেকে কিসে রুচিশীল লাগবে না ভেবে সেই টেলিভিশনের দেয়া ভাবনাই ভাবছে মানুষ।

এইসাথে আমাদের ভাবায় রাজনীতি। কোন মন্ত্রী কি করলেন আর কি করতে পারতেন তাই নিয়ে আমরা উদ্ভ্রান্ত। আমরা কোন পার্টিকে অনুসরণ করি আর তারপর সেই পার্টি ভাল এবং অন্য সব পার্টি খারাপ এই বিশ্বাস নিয়েই থাকি। কিন্তু কখনো ভাবি না যে দেশের জন্য আমাদেরও কিছু করার আছে। অর্থাৎ আমরা সমালোচনা করি কিন্তু নিজে কাজে নামতে সাহস পাই না।

আমরা খেলাধূলো নিয়ে ভাবতে ভালবাসি। কিন্তু সেখানেও চলে এসেছে

বিনোদন — কিভাবে বেশী রোজগার করা সম্ভব তাই নিয়ে ফাটকা যাতে দেশের নায়করাও যুক্ত। যে আই. পি. এল নিয়ে আমরা মেতে আছি কয়েক বছর ধরে তার যে প্রায় সব চিত্রনাট্যই ঠাণ্ডাঘরে লেখা হয় উন্মুক্ত মাঠের চেয়ে তাও আমরা প্রায় সবাই জানি, কিন্তু মেতে থাকি সেসব নিয়েই। মাঝে মাঝে অবশ্য ধরপাকড় হয় ভোট ধারেকাছে এলে। কিন্তু তাতে শ্রীশন্থের মত বোকা চুনোপুঁটিরাই ধরা পড়ে। রাঘব বোয়ালরা ঠিক পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। এসবই আমরা খুঁটিয়ে দেখি আর এসব নিয়েই ভাবি।

অর্থাৎ সার ছেড়ে অসার নিয়েই আমরা থাকি। আমাদের ভাবনা আমরা ভাবি না, আমাদের ভাবায় অন্য কেউ। আমরা শুধু অন্ধভাবে অনুকরণ করে যাই — যেটা ভালো সেটায় আলো দেখি না। কারণ ভালোকে কেউ প্রমোট করে না। যাতে আমাদের সর্বনাশ তথা সমাজের সর্বনাশ তাতেই আমরা আগ্রহী।

একবার ভেবে দেখ তো — মানুষ শব্দের অর্থ কি? মান আর হুঁশ মিলে মানুষ। আমাদের সামাজিক মান যা money-র উপর প্রতিষ্ঠিত তা সম্বন্ধে জ্ঞান তো আছে ১৬ আনা কিন্তু হুঁশ আছে কি? যদি থাকে একটু ভেবে দেখ — এভাবে আমরা কোন পতনের দিকে এগিয়ে চলেছি। নিজের ভাবনা নিজে ভাব — বিবেককে সঙ্গী করে ভাব। অন্যের কথায় মনে ভাবনাকে প্রমোট কোর না। ভেবে দেখ— কোন কাজ করলে একইসাথে তোমার পরিবার, অন্যদের পরিবার এবং তুমি সুখে থাকবে। সেই কাজে হাত দিলেই পাবে শান্তি আর আনন্দ। তাই বলব — রোবট হয়ো না। নিজের ভাবনা নিজেকে ভাবতে দাও। তবেই তো যথার্থ মানুষের মত জীবনে অগ্রসর হতে পারবে তুমি।

(২/৫/২০১৩)

প্রণাম

আমার এক শিষ্যা আজ আমায় বলছিল প্রণামের ব্যাপারে কিছু লিখতে। প্রণাম যে করে এবং যে নেয় তাদের দুজনের মধ্যেই তো এনার্জি ট্রান্সফার হয়। তাহলে প্রণাম কি যুক্তিযুক্ত?

এ প্রসঙ্গে বলি — আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার। এটা শিষ্টাচার। কিন্তু প্রণাম করার আগে একটা ব্যাপার মাথায় রাখা দরকার। প্রণাম তাঁদেরই করা উচিত যাঁরা আমাদের থেকে সাধনশক্তিতে এগিয়ে আছেন। তাই তাঁদের জোড়হাতে প্রণাম জানানো বা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা বিধেয়। এতে বড় ক্ষতি হয় না কারো। কিন্তু ক্ষতি হয় পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করলে বা অন্যের পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের মাথায় দিলে। কারণটা একটু বুঝিয়ে বলি।

প্রতিটি মানুষের শরীরের মধ্যে নিরন্তর চলছে এনার্জির প্রবাহ মূলাধার থেকে সহস্রার এবং সহস্রার থেকে মূলাধার। তাই কেউ যদি অপরের পায়ের সাথে নিজের মাথার সংযোগ করে তাহলে যার আধার উন্নত তার ভালো কিছু এনার্জি চলে যায় অন্যের কাছে এবং যার আধার ভালো নয় সে অন্যের ভালোটা বেশ কিছু পেয়ে যায়। কারণ সহস্রারের মধ্যে একটা এনার্জি টানার চুম্বক আছে। আবার যে ভালো আধারের সে যদি খারাপ আধারের কাউকে একইভাবে প্রণাম করে সেক্ষেত্রে তার ভালো কিছু এনার্জি চলে যায় খারাপ আধারের মানুষের মধ্যে। আর খারাপ আধারের মানুষের খারাপ কিছু ভালো আধারের মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যায়। তাই সাধু মহাত্মারা কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেন না। আমাদের আশ্রমেও একই প্রথা আছে।

একটি উদাহরণ দিই। বছরখানেক আগে মালদহ থেকে একজন এসেছিলেন আমার বই পড়ে। আমার সাথে আধ্যাত্মিক আলোচনা করে মুগ্ধ হয়ে আমায় প্রণাম করেন। ভদ্রলোকের চোখের সমস্যা ছিল। ভেলোরে চিকিৎসা চলছিল। এখান থেকে যাওয়ার পর উনি ফোন করেন যে ওনার চোখ এখন অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যা হল — তারপর থেকেই আমার চোখে একটা সমস্যা দেখা দেয়। চোখের সামনে কিছু আবছা ঝুল ধাচের স্পট দেখতে থাকি। দিনে দিনে সেটা আরো বাড়ে। এবার তো বই-এর প্রুফ দেখতে বেশ অসুবিধা হয়েছে। পরে এ নিয়ে আমি বাবার সাথে আলোচনা করি। বাবা বললেন যে এই

কারণেই ওটা হয়েছে। সেই থেকে আমি আমার পায়ে হাত দিয়ে আর পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম নেয়া বন্ধ করে দিয়েছি। বাবারও এরকম অভিজ্ঞতা আছে। একজন তান্ত্রিক তো তাঁর নিজের দুরারোগ্য ব্যাধি বাবার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছিলেন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। কিন্তু বাবার বীজমন্ত্রের গুরুদেব উঁচু মহারাজ বাবাকে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দেন।

তাই প্রণাম সম্বন্ধে ভালো আধারের মানুষরা সচেতন থাকবেন সর্বদা। এক ইষ্ট, গুরু আর প্রত্যক্ষ ভগবান বাবা মা তথা উচ্চকোটির সাধক সাধিকা ছাড়া কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করাই নিরাপদ।

(৩/৫/২০১৩)

মন ও মুখ

আমাদের সমাজে মন আর মুখের সংঘাত বেশিরভাগের মধ্যেই দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি — যে বলে 'অত্যাচার করা খারাপ' সেই করে বেশী অত্যাচার। যে বলে 'মানুষের ভালো করা উচিত' সেই মানুষের ক্ষতি করে বেশী। আমার শিষ্যা অঞ্জনা এই ব্যাপারেই আজ আমায় ব্লগে লিখতে বলছিল।

আমার মনে হয় — যে মানুষের মধ্যে যথার্থ জ্ঞান আছে যে কি করা উচিত এবং যে সেই জ্ঞানকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগায় তার থেকেই এমন ব্যবহার পাওয়া যায়। এই স্ববিরোধী চরিত্রদের মূল বৈশিষ্ট্য হল — এরা ভীষণ মিথ্যা কথা বলে। জ্ঞান থাকার জন্যে যেকোন মানুষকে এরা বোকা বানাতে পারে ও ঠকাতে পারে। তবে এদের চেনার একটা উপায় আছে — এদের মধ্যে নিজেকে উত্তম রূপে দেখানোর একটা প্রবণতা থাকে আর সেজন্যে যারা বরেণ্য তাদের নিন্দা করতে এরা পিছপা হয় না। আধ্যাত্মিক জগতে এমন ব্যক্তি বড় কম নেই। এদের থেকে সাবধান থাকা ভাল। কারণ যারা সৎ নয় তাদের মধ্যে শয়তান বিরাজ করে আর শয়তানকে এড়িয়ে যাওয়াই নিরাপদ।

মন ও মুখ যাঁদের এক তাঁরাই পৃথিবীতে কোনো ভাল কাজ করে যেতে পারেন। কারণ মনের সাথে মুখের সেতুবন্ধ করে বিবেক। আর যেখানে মন আর মুখের সেতুবন্ধ করে বিবেক সেখানে মিথ্যের কোনো স্থান থাকে না আর যেখানে মিথ্যার

প্রবেশ নিষেধ সেখানেই পাওয়া যায় সত্যিকারের মানুষকে।

কিন্তু যেখানে মন আর মুখের মাঝে বিবেকের সেতুবন্ধ নেই, যে এক বলে আর অন্য কাজ করে সেই ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলা সর্বতোভাবে প্রয়োজন।

তবে সেক্ষেত্রেও পাপকে ঘৃণা করবে, পাপীকে নয়।

তাকে শোধরানোর উপায় থাকলে শোধরাবে। নাহলে শুধু এড়িয়ে যাবে।

(৪/৫/২০১৩)

শয্যায় মন্ত্রজপ

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন যে রাতে ঘুমানোর আগে বা ঘুম থেকে উঠে জপ করতে কোন দোষ নেই তো? এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আজকে এখানে।

জপ করার মূল জায়গা হল আসন — ছেলেদের কম্বলের আসনে বসে এবং মেয়েদের সুতির আসনে বসে জপ করাই বিধেয়। তবে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এবং ঘুম থেকে ওঠার পরে শয্যা ত্যাগের আগেও তো জপ করতে হয়। ে

সজন্যে শয্যার উপর একটা শুদ্ধিকরণ মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

শয্যায় বসে প্রথমে "ওং আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট স্বাহা" উচ্চারণ করে শয্যার উপর ত্রিকোণ কাটতে হয়। যাঁরা ঈশ্বরের পুরুষ রূপ কৃষ্ণ বা শিবের পূজা করেন তাঁদের উপরদিকে কোণ রাখতে হয় এবং যাঁরা কালী, তারা প্রভৃতি মাতৃকার পূজা করেন তাঁদের কোণ রাখতে হয় নীচের দিকে।

তারপর "হ্রীং আধারশক্তয়েঃ কমলাসনায়ঃ নমঃ" মন্ত্রে দেবতার মানসপূজা করে "হ্রীং মৃতকায়ঃ নমঃ ফট" বলে শয্যার উপর তিনবার আঘাত করে দশদিক বন্ধন করতে হয়। তারপর করজোড়ে পাঠ করতে হয় —

"ওং শয্যেত্বং মৃতরুপাসি সাধনিয়াসী সাধকৈঃ।
অতহত্র জপ্যতে মন্ত্র হ্যস্মাকং সিদ্ধিদা ভব।।"

এই প্রথা অবলম্বন করার পর বিছানাশুদ্ধি হয়ে যায়। তখন বিছানায় বসেই মন্ত্র জপ করতে পারবেন।

(৫/৫/২০১৩)

গোপী মহিমা

বৃন্দাবনে যেসব গোপীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের লীলা পরিকর হয়ে এসেছিলেন তাদের মহিমা বড় কম নয়। এঁদের মধ্যে দুটি ভাগ আছে।

প্রথম ভাগে বিরাজ করেন ব্রহ্মকোটির মহাত্মারা যাঁরা নিত্যদেহে গোলকধামে শ্রীকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন নরদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে নেমে আসেন তখন এঁরাও আসেন নরদেহ নিয়ে। তাঁরাও নিত্য শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত, ঈশ্বরের অংশ।

এঁরাই হলেন ভগবানের পারিষদ। যেমন শ্রীদাম, সুদামা, নন্দ, যশোদা, বৃষভানু প্রমুখ। এঁরা নিত্যকাল ভগবানের সাথে যুক্ত থাকেন — ভগবান যেখানে, এঁরাও সেখানে।

গোপীদের দ্বিতীয় ভাগে আছেন সেইসব সাধকরা যাঁরা আপন সাধনবলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে লাভ করে তাঁর লীলা উপভোগ করেছিলেন। এই ভাগের গোপীরা হলেন জীবকোটিভুক্ত। এঁরা সাধনবলে গোপীদেহ লাভ করে লীলা উপভোগ করেছিলেন প্রকটলীলায়।

এঁরা মূলতঃ সবাই ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পেতে চেয়েছিলেন সম্ভোগের জন্যে। তাঁদের কামনাপুরণের জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ব্রজলীলার সঙ্গী ও সঙ্গিনী করেছিলেন। এঁরা কিন্তু সবাই ছিলেন সিদ্ধ ঋষি — প্রেমের সাধনায় সিদ্ধির ফল তাঁরা পেয়েছিলেন এইভাবে। তাই তাঁদের সবার শ্রীচরণে জানাই শতকোটি প্রণাম।

(৬/৫/২০১৩)

চেনা তবু অচেনা

আমাদের জীবনে কত মানুষ আসে। সবাই প্রথমে থাকে অপরিচিত, ধীরে ধীরে হয় পরিচিত, আবার পরিচিত হয়েও কিভাবে যেন থেকে যায় অপরিচিত। তাদের আমরা চিনি তবু যেন চিনি না। অথচ এদের নিয়েই চলে আমাদের জীবন। আমাদের খুব কাছের জনদের সাথে অনেকদিন থাকার পরও আমরা প্রায়ই আফশোষ করি যে তাকে ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল — আমাদের নিজেদেরই কি আমরা চিনতে পারি? আমাদের ভিতরে যে অতল সাগর লুকিয়ে আছে তার ভিতরে যে কত মণিমুক্তা আর কত বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে আছে তা কি আমরা নিজেরাই জানি? মানুষ তো বাইরের রূপ আর ব্যবহার দেখেই বিচার করে। তাই তাদের ভুলও হয়। কিন্তু আমরা তো নিজেদের ভিতরটাও দেখি। তাহলে আমরা নিজেদেরই চিনতে পারি না কেন? কেন বুঝি না যে আমরা চাইছি এক ভিতরে আর বাইরে অন্য কিছু পাওয়ার চেষ্টায় আছি? কেন বুঝি না যে আমাদের মন চায় এক আর মস্তিষ্ক চায় আরেক এবং এই দুয়ের দ্বন্দে আমরা হই জেরবার?

ভেবে দেখতে গেলে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ভালো মন্দ দুইই আছে। এখন সে যেটি হওয়ার চেষ্টা করবে সেটিই হবে। একজন আধ্যাত্মিক পথের পথিকরূপে আমি তো বলতে পারি — আমার নিজের মনের অথৈ সাগরে ডুব দিয়ে দুইরকমের বস্তুই দেখেছি — যেমন সেখানে আছে অমৃত তেমনি আছে হলাহল। যেমন আছে আধ্যাত্মিক চেতনা তেমনি আছে নানা প্রলোভন। তাই আমি বিশ্বাস করি— যে মানুষ হিসেবে আমি করতে পারি না এমন কোনো খারাপ এবং ভালো কাজ নেই। প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। তবে যে যেটাকে বেছে নেবে তার জীবন সেটা ঘিরেই চলবে। তার সুকর্মফল সেইমতই বাড়বে কমবে।

আমি জানি — যদি হলাহল বেছে নেই সেক্ষেত্রে আমি নিজেই ডুবব। জন্মজন্মান্তর ধরে সাধনা করে যে জায়গাটা পেয়েছি সেই জায়গাটা হারাব। শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলির বংশে জন্মগ্রহণ করেছি। তাই ঠিকমত সাধন করলে আমারই হবে উত্তরণ। অতএব নিজের স্বার্থেই ভালো পথটিকে বেছে নিয়েছি। নিজের চির চেনা ও অচেনা মনকে বুঝিয়েছি — আলোর পথে এগোলে আমারই লাভ। তাহলে কেন প্রলোভনে সাড়া দেব? অতএব লাভের লক্ষেই Divine Love এর পথে নেমেছি। আমাদের যে একজন্ম দেখে বিচার

করলে চলবে না। অনন্তের যাত্রায় যে আমাদের প্রতিটি জন্মের লাভক্ষতির সম্ভাবনার কথাই রাখতে হবে। তাহলেই তো আমরা ঠিকমত এগোতে পারব চিরন্তনের লক্ষ্যে।

(৭/৫/২০১৩)

শীতলী কুম্ভক

অনেকেই আমাকে অনেকদিন ধরে বলেছেন যোগ নিয়ে কিছু লেখার জন্যে। যোগের সম্বন্ধে লেখার তো কত কিছুই আছে। আর গরমকালে ঠাণ্ডার প্রতিই তো মানুষের আকর্ষণ হয়। তাই ভাবলাম শীতলী কুম্ভক দিয়ে শুরু করা যাক।

অনেকে হয়ত বলবেন — এতে কি ফল হয়? উত্তরে বলি — এতে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং শরীরে জ্যোতির প্রকাশ ঘটে। যোগের পথে যাঁরা আছেন তাঁরা এটি নিয়মিত অনুসরণ করেন। গোরখ সংহিতায় এ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বলা আছে।

এতে জিভ সরু করে ঠোঁট দিয়ে বাতাস টানতে হয়। তারপর সেই বায়ু অনেকটা ঢোঁক গেলার মত গিলে পেতে চালনা করতে হয়। তারপর কিছুক্ষণ সেই বাতাসকে কুম্ভক করে ধরে রেখে দুই নাক দিয়ে রেচন করতে হয়। এরকম করে বারবার বাতাস টেনে শীতলীকুম্ভক করলে কিছুদিনের মধ্যেই রক্ত পরিষ্কার হয়, অজীর্ণ এবং পিত্তকফের হাত থেকেও মুক্তি মেলে। সেইসাথে শরীরও অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। দিনেরাতে অন্তত তিন চারবার এই যৌগিক ক্রিয়া যদি পাঁচ মিনিট করেও করে যায় তবে বিশেষ উপকার হয়।

(৮/৫/২০১৩)

গুরুকরণের সাধারণ কারণ

অধিকাংশ মানুষ কেন গুরুকরণ করে জানো? যাতে সাংসারিক সমস্যার থেকে মুক্তি পায়। তাদের কাছে সিদ্ধি লাভের কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু দরকার স্বামীর চাকরিতে উন্নতি, স্ত্রীর শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকা, সন্তান ছোট হলে তার পড়াশোনা ভালো হওয়া, সন্তান বড় হলে তার বিয়ে বা চাকরির সমাধান করা ইত্যাদি কাজগুলো পূরণ করে দেয়ার জন্যে একটি যন্ত্র। সাধারণ মানুষের কাছে গুরু হল এই যন্ত্র। সেজন্যে তারা তাদের পার্থিব ঝামেলা নিয়ে গুরুকে বিরক্ত করে। তাদের যা অসুবিধা হবে সেটাই গুরুকে মেটাতে হবে — এমনটাই তাদের চাহিদা।

তাই গুরু যারা হয় তাদের আগে শিষ্যকে চিনে নেয়া প্রয়োজন। যারা জাগতিক জগতের সাথে ওতপ্রোত হয়ে আছে এবং জাগতিক ছাড়া চাহিদা নেই তাদের দীক্ষা দেয়াই উচিত নয়। বলা উচিত — আগের স্তরের কাজগুলো সেরে এস, তারপর দীক্ষার কথা ভেব। কারণ দেখ — এসব শিষ্যরা ভাবে — আমি যা করি করি গুরু আছে সামলে নেবে।

কিন্তু গুরু তো নিজে সাধনা করে সাধনশক্তি অর্জন করেছেন। শিষ্যের প্রারব্ধের প্রতিকার করার জন্যে কেন তিনি নিজের সাধনশক্তি দেবেন?

তাই তাঁর উচিত শিষ্যকে আগে দীক্ষার স্তরের উপযুক্ত করে নিয়ে তারপর দীক্ষা দেয়া। কারণ আধ্যাত্মিক জগতের উপর আকর্ষণ না জাগলে, নিজেকে জানার বা বোঝার ইচ্ছা না জাগলে দীক্ষা নেয়ার যোগ্যই হয়না মানুষ। তাই এদের দীক্ষা দেয়া মানে গুরুর নিজের আটকে যাওয়া। কারণ প্রতিটি শিষ্য মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত গুরুর যে মুক্তি নেই।

(১০/৫/২০১৩)

সম্পর্ক যেন গাছের গুঁড়ি

মানুষের জীবনে সব সম্পর্কই গাছের গুঁড়ির মত। সম্পর্ক যত গভীর হয় গুঁড়িও তত মোটা হয়। কিন্তু গভীর সম্পর্ক তৈরী হলেই যে কেউ তা নিয়ে যা খুশী করতে পারবে সেই ধারণা ভুল। হয়তো একটু সরু গুঁড়ির গাছকে দুয়েক আঘাতেই কেটে দেয়া যায় এবং মোটা গুঁড়ির গাছকে অত অল্পে কাটা যায়না। তবে তাই বলে যে মোটা গুঁড়ির গাছকে কাটা যায় না এমনও তো নয়। হয়তো অল্প কয়েক আঘাতে সেই মোটা গুঁড়ির কিছু হয় না। সামান্য রক্তপাতই হয়তো হয় অল্প আঘাতে। (গাছ কাটলে যে কষ বেরয় তাকেই বলা হয় গাছের রক্ত) কিন্তু সেখানে বারবার আঘাত পড়লে মোটা গুঁড়িও একদিন ভেঙে পড়ে। একই কথা যেকোনো গভীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সে যতই গভীর হোক— বারবার আঘাত তাকেও কেটে দেয় একদিন।

তাই ভালো সম্পর্ক পেলে — সে বন্ধু হোক, ভাইবোন হোক, প্রেমিক-প্রেমিকা হোক, স্বামী স্ত্রী হোক, গুরু শিষ্য হোক — তাকে ভগবানের দান মনে করেই যত্ন করা উচিত। একটি গাছকে বড় করে তুলতেই সময় লাগে। সেটিকে কাটতে বিশেষ কিছু সময় লাগে না। তাই জীবন যদি তোমাদের হাতে কোন ভালো সম্পর্ক তুলে দেয় তাকে রক্ষণাবেক্ষণ কোর ঈশ্বরের আশীর্বাদের রূপে — তার উপর আঘাত পড়তে দিও না। সেখানে আঘাত করা মানে কিন্তু সেই প্রথম জীবনের কালীদাসের মত অবস্থা হবে — অর্থাৎ যে ডালে বসে আছ সেই ডালটিকেই কাটতে চাইছ। কখনো ভেবনা — এ সম্পর্ক অনেক গভীর। শত আঘাতেও কিছু হবে না। প্রতিটি আঘাতই তোমাকে সেই সম্পর্ক থেকে একটু একটু করে দূর করে দেবে। তারপর একদিন দেখবে — তুমিও আছ, সেও আছে কিন্তু সম্পর্কটা আর নেই। তখন হাজার চেষ্টা করেও আর ফিরে পাবে না সেই হারিয়ে যাওয়া দিন। এই নশ্বর পৃথিবী থেকে যা যায় তা চিরতরেই যায়। তাই সময় থাকতেই সাবধান হওয়া ভালো।

(১১/৫/২০১৩)

অক্ষয়তৃতীয়া

আজ অক্ষয় তৃতীয়া। অক্ষয় তৃতীয়া আমাদের দেশে একটি পুণ্যতিথি রূপেই বিবেচিত। এটি বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে পড়ে।

অক্ষয়তৃতীয়ার গুরুত্ব বিশাল। এদিন অনেকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল।

১) এদিনই রাজা ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন।

২) এদিনই গণপতি গণেশ ব্যাসদেবের মুখনিঃসৃত বাণী শুনে মহাভারত রচনা শুরু করেন।

৩) এদিনই দেবী অন্নপূর্ণার আবির্ভাব ঘটে।

৪) এদিনই সত্যযুগ শেষ হয়ে ত্রেতাযুগের সূচনা হয়।

৫) এদিনই কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। এদিনই কুবেরের লক্ষ্মী লাভ হয়েছিল বলে এদিন বৈভব-লক্ষ্মীর পূজা করা হয়।

৬) এদিনই বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম জন্ম নেন পৃথিবীতে।

৭) এদিনই ভক্তরাজ সুদামা শ্রীকৃষ্ণের সাথে দ্বারকায় গিয়ে দেখা করেন এবং তাঁর থেকে সামান্য চালভাজা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সকল দুঃখ মোচন করেন।

৮) এদিনই দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে যান এবং সখী কৃষ্ণাকে রক্ষা করেন শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতের পরিত্রাতা রূপে।

৯) এদিন থেকেই পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রথ নির্মাণ শুরু হয়।

১০) কেদার বদ্রী গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর যে মন্দির ছয় মাস বন্ধ থাকে এইদিনই তার দ্বার উদঘাটন হয়। দ্বার খুললেই দেখা যায় সেই অক্ষয়দীপ যা ছয়মাস আগে জ্বালিয়ে আসা হয়েছিল।

এহেন অক্ষয়তৃতীয়াতে যেকোন শুভকাজ শুরু করা ভালো। এই তিথির বিশেষত্ব হচ্ছে — এদিন যে কাজ করা হোক না কেন তার ফল হয়ে দাঁড়ায় অক্ষয়। যদি ভালো কাজ করা হয় তার জন্যে আমাদের লাভ হয় অক্ষয় পূণ্য আর যদি খারাপ কাজ করা হয় তবে লাভ হয় অক্ষয় পাপ। তাই এদিন খুব সাবধানে প্রতিটি কাজ করা উচিত। খেয়াল রাখতে হয় — ভুলেও যেন কোনো খারাপ কাজ না হয়ে যায়। কখনো যেন কটু কথা না বেরোয় মুখ থেকে। কোনো কারণে যেন কারো ক্ষতি না করে ফেলি বা কারো মনে আঘাত দিয়ে না ফেলি। তাই

এদিন যথাসম্ভব মৌন থাকা জরুরী। আর এদিন পূজা, জপ, ধ্যান, দান, অপরের মনে আনন্দ দেয়ার মত কাজ করা উচিত। যেহেতু এই তৃতীয়ার সব কাজ অক্ষয় থাকে তাই প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হয় সতর্কভাবে। এদিনটা ভালোভাবে কাটানোর অর্থ — সাধনজগতের অনেকটা পথ একদিনে চলে ফেলা। এবারের অক্ষয়তৃতীয়া সবার ভালো কাটুক এই কামনাই করি।

(১৩/৫/২০১৩)

দেবলোকের স্মৃতি

আজকে আমার "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" গ্রন্থের "বাসুকিতাল-কালিন্দী খাল-পঞ্চ বদ্রী পর্ব" পুনর্মুদ্রিত হয়ে আশ্রমে এল। এই পর্বটির তৃতীয় সংস্করণ এটি।

কোথায় যেন পড়েছিলাম শিবরাম চক্রবর্তীর লেখায় — বই মুদ্রিত হওয়া মানে সন্তান হওয়া আর পুনর্মুদ্রিত হওয়া মানে নাতি হওয়া। সেই অনুসারে আমার তো নাতিতেই ঘর ভর্তি এখন।

আজ মনে পড়ছে — হিমালয়ে কাটিয়ে আসা সেই দিনগুলোর কথা যার উপর ভিত্তি করে লিখেছি আমার এই ৪ খণ্ডে সমাপ্ত ভ্রমণকাহিনী। কি ভয়ঙ্কর সুন্দর ছিল সেই পথ। নির্জন, নিরিবিলি, আকাশে বাতাসে শান্তির অনুরণন, মাঝে মাঝে সাধুসন্তদের সাক্ষাত। আর সেইসঙ্গে পথ চলা। পথে বিপদ আছে। চলায় শ্রান্তি আছে — কিন্তু একটু বিশ্রাম নিলেই হিমালয়ের কৃপায় সব কষ্ট মিলিয়ে যায়।

মনে আছে — ১৯৯৮ সালে হিমালয়ে আমরা যখন গেছিলাম তখন আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স শূন্য। যা টাকা ছিল ব্যাঙ্কে বাবা সবই তুলে নিয়েছিলেন। ফেরার পর কি খাওয়া দাওয়া হবে তার ঠিক ছিল না। আয়ের উপায় বলতে একমাত্র বাবার বই বিক্রি। আমার তো তখন সবেধন নীলমণি একটাই বই — মহাসিন্ধুর ওপার থেকে। (দে বুক স্টোরের ম্যানেজার স্বপনদা রসিকতা করে বলতেন — ঐতো তোমাদের বাবা ছেলের পাবলিকেশন। বাবার একটা বই "মহাপীঠ তারাপীঠ", ছেলেরও একটাই বই "মহাসিন্ধুর ওপর থেকে" ; ওই দুটো বই সম্বল। বর্তমানে অবশ্য এত বই বেরিয়ে গেছে যে স্বপনদা এখন বদলেছেন মত—

দেখা হলে বলেন, "আর কি নতুন বই আসছে আপনাদের?" সময়ের সাথে সাথে তুমিটা আপনি হয়েছে।)

তবে ব্যাঙ্কের ভাঁড়ার শেষ করে হিমালয় ভ্রমণে গেলেও প্রাণভরে ভ্রমণ করেছিলাম আমরা। আর সেইসময়েই ঠিক করেছিলাম — হিমালয়ের উপর একটি ভ্রমণ কাহিনী লিখব। ইতিপূর্বে তো অনেক লেখক হিমালয় নিয়ে লিখেছেন। আমিও লিখব আমার নিজস্ব স্টাইলে। আমার পরিকল্পনা ছিল — ভ্রমণ কাহিনীটা হবে ভিডিও ফিল্মের মত আর সেই ভিডিও ফিল্ম আমি শব্দ দিয়ে গড়ব। সেইমত ছোট একটি ডায়েরি নিয়ে পথে নামতাম। যেখানে যা দৃশ্য দেখতাম তার বিবরণ খাতায় তুলে নিতাম। সেসময়ে আমার নিজের ক্যামেরাও ছিল না। রথীনদা তথা মন্টুদার ক্যামেরা ধার নিয়ে পাঁচ রীল ফিল্ম কিনে ফটো তুলেছিলাম। তাই যেখানে মন্টুদা ছিলেন আমার সাথে সেখানে আমার ছবি উঠেছে। যেখানে তিনি নেই সেখানে আমার ছবি নেই।

তারপর শুরু হল হিমালয়ের লীলা। কত মহাত্মাদের সেবার দর্শন করেছি। নাগাজীর মত মহাত্মা তো কোটিতে গোটিক মেলে। তাঁর স্নেহছায়ায় পথ চলার সৌভাগ্যও লাভ করেছি। হিমালয়ের বিজন অঙ্গনে কত উচ্চকোটির সাধক আমায় কৃপা করেছেন। তাঁদের জন্যেই আমার হিমালয় ভ্রমণ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আজ তাঁদের কৃপায় লেখা "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" গ্রন্থের সুনাম দিকে দিকে। তবে সেইসময়ে হিমালয়কে আমি যেভাবে দেখেছিলাম তার সেই রূপসুধা পান করার উপায় আর এখন নেই। যন্ত্রসভ্যতার বীজ এখন সেখানেও জেগে উঠেছে। তাই হিমালয়ের সেই প্রশান্তি এখন দিনেরাতে তেমনভাবে উপভোগ করা যায় না। আমার সৌভাগ্য — প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, জলধর সেন, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কু মহারাজ হিমালয়ের যে রূপসুধা পান করতে পেরেছিলেন আমি ছিলাম সেই মহান হিমালয় প্রেমিকদের শেষ উত্তরসুরী — Last of the Mohicans যার হিমালয় ভ্রমণ পর্যন্ত হিমালয়ের সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির অমৃত পান করা যেত। বর্তমানে যন্ত্রসভ্যতার আক্রমণে হিমালয় জর্জরিত। তবু আজো হিমালয়কে ভালোবেসে তার কাছে গেলে হিমালয় কৃপা করে। শুধুমাত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে এখন হিমালয়কে নিজের রূপে পাওয়া যায় যা অন্যসময়ে যায় না।

আমার "দেবলোকের অমৃতসন্ধানে" গ্রন্থে লেখা আমার সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির স্মৃতি বড় ভিড় করে আসছে মনে। সেদিন আমি কিছুই ছিলাম না। আজ যেটুকু হতে পেরেছি সবই হিমালয়ের দয়া, গোপালের কৃপা আর মা বাবার

আশীর্বাদ। তাই ফেলে আসা দিনগুলি বরাবরই আমার প্রেরণা রূপে দেখা দেয়। শূন্য থেকে শুরু করে আজকের দিনে আসার এই পথটুকু যে ইষ্টকৃপার জন্যেই অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে।

(১৩/৫/২০১৩)

শিবপূজা

অনেকেই আমায় প্রশ্ন করেন — শিব মানে কি? এক্ষেত্রে সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দেখবেন — শি যুক্ত বন ইতি শিব।

শিবপূজা মূলত হল আত্মপূজা। অর্থাৎ আমাদের সহস্রারে সুপ্তভাবে যে শিব গুপ্ত হয়ে আছেন তাঁকে জাগানোর জন্যেই তো আমাদের সাধনা। শিবপূজা আমাদের ভিতরের সেই পরমপুরুষকে জাগানোর পূজা।

তোমরা যত শিবপূজা করবে তত তাঁর কৃপা লাভ করবে নিজের মাঝে। আর যত তাঁর কৃপা লাভ করবে অন্তরে তত আধ্যাত্মিক জগতে তোমাদের উত্তরণের পথ সুগম হয়ে উঠবে।

এই শিবপূজার সাথে যখন পড়ে সিদ্ধ বীজমন্ত্র তখন নিয়মিত জপ ও সাধনা করে গেলে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটবে আর তারপর যখন সেই মহাশক্তি সহস্রারে গিয়ে শিবের সাথে যুক্ত হবে তখনই লাভ করবে সিদ্ধি আর সেই হবে জীবন থেকে পরম প্রাপ্তি। শিবপূজার মাধ্যমে এভাবেই আমাদের উত্তরণ ঘটে আলোর দিগন্তে।

(১৫/৫/২০১৩)

কিভাবে থাকা ভালো এই জগতে

এই পৃথিবীতে সবই দুদিনের খেলা। যা নিয়ে আমরা ভাবছি, যা আঁকড়ে ধরে আমরা বাঁচতে চাইছি, যা ছাড়া আমাদের দিন চলতে চায় না — সবই দুদিনের অলস মায়া।

এই পৃথিবী মায়ার খেলাঘর। এখানে সবাই খেলাঘর গড়ছে, সাজাচ্ছে, সেটিকে কেন্দ্র করে বাঁচছে আর তারপর সেটিকে ফেলে রেখে নিজেই হারিয়ে যাচ্ছে কোনো অজানা জগতে।

আসলে এই জগতে টেঁকে না কিছুই শুধু মানবকল্যাণের কর্ম ছাড়া। আমি জানি — আমার সৃষ্টি বেঁচে থাকবে শতাব্দীর পর শতাব্দী কিন্তু যে স্রষ্টা সেই আমার এই স্থূলদেহ, অর্থাৎ স্থূল আমি টিকব না। টিকবে না কেউই। আজকে অনেকের আমাকে ছাড়া চলে না।

কিন্তু বিধাতার এই জগতে যে কেউই অপরিহার্য নয়। সবারই জায়গায় কেউ না কেউ ঠিক এসে যায়। তাই নিজেকে বাদ দিয়েই আমাদের জগতকে দেখা ভালো নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে। তাহলে আর মায়া আমাদের বন্ধনে বাঁধতে পারবে না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি তো তাই করি — নিজের জগতকে দেখি নিজেকে বাদ দিয়ে — কর্তব্য করি কিন্তু বন্ধনে ধরা না দিয়ে। তাতে দেখি আমাকে বাদ দিয়েই সবকিছু সুন্দরভাবে হয়ে যাচ্ছে। অতএব এখানে আমি থাকাও যা, না থাকাও তাই। সবার জন্যেই আছি আমি আবার কারোর হয়েই নেই। কর্ম আমাকে করতে হবে তাই করছি। সত্যিকারের ভক্তদের আলোর পথে নিয়ে যেতে আমি দায়বদ্ধ। তাই তাদের জন্যে তাদের পাশে আমি নিশ্চয়ই আছি। কিন্তু আমি থেকেও নেই। আবার না থেকেও আছি। এটাই হল — এই জগতে থেকেও জগতের না হয়েই জগতের জন্যে কাজ করে যাওয়ার ব্রতে আমার মূল মন্ত্র।

(১৭/৫/২০১৩)

বন্ধু-র পথ বড় বন্ধুর

জীবন হল একটি কর্মক্ষেত্র। এটিকে তুমি যেমন বানাবে এটি তেমনিভাবেই ধরা দেবে তোমার কাছে। জীবনকে ভালোভাবে গড়তে পারলে তার কৃতিত্ব তোমার। সেটির বারোটা বাজালে তার দায়ও তোমার। আর এই কাজে তোমার পাশে বড় ভূমিকা নেবে তোমার বন্ধুরা।

জীবন তোমায় অনেক বন্ধু দেবে। অনেক বন্ধু ছিনিয়েও নেবে। আসবে অনেকে, থাকবে কিন্তু সামান্য কয়জন। এই বন্ধুরা আত্মীয়দের মধ্যে থেকে আসতে পারে, আসতে পারে স্কুল, কলেজের সুত্র ধরে কিংবা কর্মক্ষেত্রের সহকর্মী হয়ে। কিন্তু তারা সত্যিকারের বন্ধু কিনা তা বোঝার অবসর ঠাকুরই দেবেন তোমায়। যখন দুঃখ আসবে তখনি চিনবে কে সঠিক বন্ধু। সুখের সময়ে বন্ধু সবাই। সেইসময়ে বোঝা যাবে তুমি কেমন বন্ধুবৎসল। আর দুঃখের সময় এলে বোঝা যাবে তোমার বন্ধুরা কতটা বন্ধুবৎসল। যারা হারাবার তারা তখনি হারাবে। আর যারা সেইসময়েও থাকবে তোমার পাশে বুঝবে তারাই যথার্থ বন্ধু। সেইসময়ের বন্ধুদের খুব ভালোভাবে ধরে রাখতে হয়। কারণ সেই হল যথার্থ জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। তারা একবার হারিয়ে যাওয়া মানে বিরাট ক্ষতি। তাই দুঃখের সময়ের বন্ধুদের আঁকড়ে থাকবে আর যারা শুধু সুখের পায়রা তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে থাকাই ভালো।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি — আমার বন্ধুরা সংখ্যা খুব কম। কারণ সমভাবাপন্ন ছাড়া আমি মিশতে পারি না। আর যাদের সাথে একবার মিশে যাই তাদের ছাড়তে পারি না। স্কুলে আমি 'একঘরে' ছিলাম সবার সাথে মিশতে পারতাম না বলে। অবস্থা বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে অবশ্য মিশুকে হয়ে উঠি তবে তেলে জলে ধাঁচে। মিশতাম উপর উপর। এইসময়ে বন্ধুও পেয়েছি কিছু, আবার হারিয়েওছি। তবে আধ্যাত্মিক জীবনে আসার পরই পেলাম কিছু এমন বন্ধু যাদের সাথে নিজের আমিকে ভাগ করে নেয়া যায়। এই সাধনপথে তাদের সাহচর্য্য আমাকে খুব সাহায্য করে। এদের মধ্যে আমার আধ্যাত্মিক অধিবেশন গ্রুপের পাঠক-পাঠিকা বন্ধুদের কথা বলতেই হয় যাদের প্রেরণা আমাকে বিরাট সাহায্য করে এগিয়ে যেতে। আসলে আমি বরাবরই মন দেখে বন্ধু বেছেছি। তাই বন্ধুসূত্রে কখনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি আমায়।

(৪/৬/২০১৩)

জন্মদিন

আজকে আমার ৪১ পূর্ণ হল। পা রাখলাম ৪২এ। সকাল থেকেই ফোনে, ই-মেলে, ফেসবুকে অনেক বন্ধুরা, ভক্তরা, শিষ্য শিষ্যারা আমাকে জানাচ্ছেন জন্মদিনের শুভেচ্ছা। এই মুহূর্তে মনে পড়ে যায় ছোটবেলার কথা। ছোটবেলায় জন্মদিন এলেই মনটা খুশীতে ভরে যেত। মূলতঃ সেইসময়ে বন্ধুদের আগমন আর বড়দের উপহারের জন্যেই ভালো লাগত জন্মদিন। ধীরে ধীরে বন্ধুবান্ধবরা জীবনের দিকে দিকে ছড়িয়ে যেতে লাগলো আর আমিও বন্ধ করে দিলাম জন্মদিনের উৎসব। অতএব এই দিনটা আমি মূলতঃ বিগত কয়েক বছর ধরে একলাই কাটাই। তবে যারা আমাকে ভালবাসেন ঠিক শুভেচ্ছা জানান ফোনে বা এসে। কিন্তু ফেসবুক হওয়ার পর থেকে আবার বন্ধুদের ফিরে পাওয়া গেল। সেইসাথে আমার লেখনীর মাধ্যমে সংযুক্ত আত্মার আত্মীয় ভক্ত মানুষরাও আসতে শুরু করলেন। তাই এখন আমি জন্মদিন না করলেও জন্মদিনের উৎসব একরকম হয়েই যায়। এদিন সবার শুভেচ্ছা পেয়ে আমিও অভিভূত। সবার এই ভালোবাসাই যে আমার জীবনের অন্যতম সেরা প্রাপ্তি।

তবে ইদানিং জন্মদিনটা আমার কাছে পেয়েছে অন্য মাত্রা। এদিনটা এলেই আমার মাথায় আসে একটি equation — অনেকটা ক্রিকেটের মত —

OVERS OF LIFE GONE-41
OVERS OF LIFE REMAINING - UNKNOWN
REQUIRED RUN - TO REALISE THE SELF AND TO BE ONE WITH PARAMATMA.

প্রতি জন্মদিন এলেই মনে হয় — বেলা তো বয়ে যাচ্ছে। এ জীবনে পেলাম অনেক, দিলামও অনেক। কিন্তু পথের তো শেষ নেই — সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি, অতিসিদ্ধি। তাই চলতে হবে আরো অনেক, পেতে হবে আরো অনেক, বিলোতেও হবে আরো অনেক। এভাবেই যে চলতে হয় জীবন থেকে মহাজীবনের পথে। এ পথে যেটুকু পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করব তা যেন হয় ভগবত প্রাপ্তির প্রচেষ্টা। পার্থিব কিছু পাওয়ার জন্যে যেন চেয়ে সময় নষ্ট না করি — যা আজ আছে, কাল থাকবে না। তাই চেয়ে কেন সময় নষ্ট করব? হাতে সময় তো বেশী নেই। যা আছে তা ব্যবহার করতে হবে ভগবান প্রাপ্তির জন্যেই। প্রতিটি জন্মদিন যেন

আমাকে সেই বার্তাই দিয়ে যায় — পথিক, এগিয়ে চল। বেলা যে গেল। শেষ খেয়ায় ওঠার সময় এগিয়ে আসছে। তাই এবার সেরে নাও কাজের পালা।

(৫/৬/২০১৩)

অজপা জপ

অজপা জপ হল বহু প্রাচীন জপের প্রণালী। বাল্মিকি নারদের কাছ থেকে যে উল্টো নাম পেয়েছিলেন সেও তো ছিল অজপা। আজ সাধনজগতে অজপার মূল্য অপরিসীম।

অজপার সবচেয়ে বড় উপহার হল সমাধির অভিজ্ঞতা লাভ। সাধারণত যোগে সমাধিলাভ হয় কুম্ভকের মাধ্যমে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে যখন আপনা থেকেই নিরন্তর কুম্ভক হয়ে যায় তখনই আসে সমাধি। কিন্তু অজপাতে কুম্ভকে না গিয়েই সমাধি লাভ করা যায়। অজপা হল শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ। যে মন্ত্র তুমি নিলে তা শ্বাস দেয়ার সময় জপ করবে আর ছাড়ার সময়ে জপ করবে। সেটাই হল অজপা। এতে মন্ত্রের হিসাব রাখার দরকার নেই। শুধু মনেপ্রাণে মন্ত্রের সাথে একাত্ম হয়ে জপ করে যাওয়া। কথিত আছে — আমাদের জীবাত্মা অনাহত চক্রে উপবিষ্ট হয়ে নিরন্তর নাম করে চলেছে অজপায়। সে নাম আমাদের ভিতরে চলছে নিরন্তর। সাধনার মাধ্যমে বহিরঙ্গের নামকে সেই নামের সাথে একাত্ম করে নেয়ার জন্য অজপার সৃষ্টি। একে একইসাথে হংস জপ ও সোহং জপ বলা হয়। শ্বাস নেয়ার সময়ের জপ হল হংস জপ আর শ্বাসত্যাগের সময়ের জপ হল সোহং। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সেই জপকেই বলা হয় অজপা।

এই অজপার একটি সহজ প্রণালী আছে — যারা জপ করতে চাও তারা প্রথমে কিছুক্ষণ কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে থেক একদৃষ্টে — সেটি ইষ্টদেবের মুর্ত্তি হলে সবচেয়ে ভালো। যখন খালি চোখে সেই বস্তুর উপর মনোসংযোগ হয়ে যাবে তখন চোখ বন্ধ করে তাকে ধ্যান কর আর অজপা জপ শুরু কর। এতে ফল পাবে দ্রুত।

এই প্রসঙ্গে যোগের আরেকটি কথা বলি — আমাদের ডাইনে আছে ইড়া নাড়ি আর বাঁয়ে পিঙ্গলা নাড়ি। পিঙ্গলা নাড়ি নির্দেশ করে আমাদের দেহের শারীরিক শক্তি ও ইড়া নাড়ী নির্দেশ করে মানসিক শক্তি। এই দুই নাড়িতে আলাদাভাবে

যতক্ষণ শ্বাস প্রবাহিত হয় ততক্ষণ সমাধি হয় না। যখন প্রাণায়ামের মাধ্যমে দুই নাকের শ্বাস হয়ে যাবে সমান তখনই জাগ্রত হবে সুষুম্না নাড়ি আর তখনই ধ্যান হবে যথার্থ। অজপা জপ সেই সুষুম্না নাড়ির জাগরণকে তরান্বিত করে। অজপা জপে প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। একটি গভীর শ্বাস নেয়া, একটু relax, তারপর আবার শ্বাস ছাড়া আর সেইসাথে মন্ত্রজপ। এভাবে মিনিটে আমরা ১৫ বার শ্বাস নেই, দিনে ২১,৬০০ বার। অজপা ঠিকমত করা গেলে বিনা চেষ্টায় দিনে ২১,৬০০ বার জপ হয়ে যায়। সোহং জপ করলে মন্ত্রের অর্থ আর কল্পনা করতে হয় না। তবে যাদের দীক্ষা হয়েছে তারা নিজেদের বীজমন্ত্র এই জায়গায় জপ করতে পার।

১৩/৬/২০১৩

ক্রিয়া

ক্রিয়াযোগ বড় গুরুত্বপূর্ণ যোগ। ক্রিয়া করলে সম্পূর্ণ মানবদেহ অধ্যাত্মভাবে আলোকিত হয়ে যায়। এতে চতুর্বর্গলাভ হয়। এককথায় ক্রিয়াযোগে সাধন শরীর হয়ে ওঠে ভাগবত শরীর। প্রথম ক্রিয়া মানুষের শরীরের বিভিন্ন glandকে শক্তপোক্ত করে যা সমাধিলাভে সাহায্য করে। দ্বিতীয় ক্রিয়া মনের উপর দখল আনে এবং সাধকের ভিতরে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেয়। তৃতীয় ক্রিয়া দূর করে দেয় মনের চাঞ্চ ল্য। চতুর্থ ক্রিয়া liver ও pancreas-কে সুস্থ করে এবং দেহের যৌন শক্তিকে পরিণত করে ভগবত শক্তিতে। অনেকে ভাবে — সাধনপথে এগোতে হলে কামকে বা যৌনতাকে নির্মুল করতে হবে। কিন্তু যৌনতাকে নির্মুল করলে সাধনায় অগ্রসর হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ যৌন শক্তির মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে থাকে আমাদের দেহের আসল শক্তি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। যৌনশক্তিকে ক্রিয়ার মাধ্যমে দমন করে তাকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এরপরও ছয়টি আরো উচ্চ ক্রিয়া আছে। এই যোগের জন্য চাই নির্দিষ্ট আধার এবং সুস্থ সবল শরীর। আর সেইসাথে গুরুর প্রতি ভক্তি, নিবেদন ও অধ্যবসায়। তাহলেই ক্রিয়ায় এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন — এই ক্রিয়া মূলতঃ কি? এ প্রসঙ্গে দেখা যাক সৃষ্টিপ্রকরণ কি বলছে। ব্রহ্ম চিরনিশ্চ ল। তার এক শতাংশ চঞ্চ ল হয়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে সৃষ্টি করেছিল এই জগত। ওই এক শতাংশ চাঞ্চ ল্য পঞ্চ তত্বের মধ্য দিয়ে লম্ব তরঙ্গ বিশিষ্ট হয়ে সমস্ত সৃষ্টি রচনা করল। এভাবেই হল জীবনের সৃষ্টি। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে — তবে মৃত্যু কি? মৃত্যু হল — এই চাঞ্চ ল্যের ক্রমাগত স্থির অবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া। প্রাণের তরঙ্গ প্রকৃতির নিয়মে হ্রাস পেতে পেতে যখন এক লক্ষ থেকে ১০ শতাংশ তরঙ্গায়িত হয় তখন জীবের মৃত্যু হয়। সেই সময়ে এই দশ শতাংশ তরঙ্গের সঙ্গে জীবাত্মার ফেলে আসা জন্মের সমস্ত সংস্কার বীজের আকারে থেকে যায়। এই সংস্কার আত্মাকে আবার নতুন জন্মের দিকে আকর্ষণ করে এবং সেই ১০ শতাংশ প্রাণের তরঙ্গ যখন বাড়তে বাড়তে এক লাখে পৌঁছয় তখন জীবের আবার জন্ম হয়। এই হল জন্ম মৃত্যুর আসল অবস্থা।

এই জন্ম মৃত্যুর থেকে মুক্তির জন্যেই ক্রিয়ার দরকার। জীব যদি কোনো প্রকারে সাধনার মধ্য দিয়ে এক লক্ষ থেকে দশ শতাংশ প্রাণের চাঞ্চ ল্যকে অতিক্রম করে শূন্য শতাংশে পৌঁছে যায় তাহলেই ঘটে তার ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ। সে তখন তার উৎস ব্রহ্মের সাথে মিলে যায় পরমানন্দভরে। তখন আর তাকে ফিরে আসতে হয় না। পৃথিবীতে সাধনার মাধ্যমে ব্রহ্ম আর জীবের মিলনের উপায় হল যোগ আর প্রাণের চাঞ্চ ল্যকে কমিয়ে প্রাণকে থামানোর উপায় হল ক্রিয়া। অর্থাৎ ক্রিয়া আর যোগের এই পন্থা হল ক্রিয়াযোগ। এই ক্রিয়াযোগের মাধ্যমেই প্রাণের অনন্ত গতিকে থামিয়ে স্থির ব্রহ্মের সাথে যুক্ত করে দেয়া যায়। সেই লক্ষেই চলে ক্রিয়াযোগীদের সাধনা।

১৪/৬/২০১৩

পরিবর্তন

আমাদের জীবনে কত কিছু ঘটে যায় অহরহ। সময়ের সাথে সাথে পাল্টে যায় পরিবেশ। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয় প্রতিটি মানুষকেই। তা সে ভালোমনেই মানুক বা বিরক্ত হয়েই। এই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার নামই জীবন।

আমাদের দেহেরই কত পরিবর্তন হয়। একদিন আমি ছিলাম শিশু। ধীরে

ধীরে হয়েছি বালক, কিশোর, তরুণ। বর্তমানে আমি যুবক। এরপর হব প্রৌঢ়। তারপর আসবে বার্দ্ধক্য। অবশেষে ঝরে যাব একদিন শীতের পাতাঝরা গাছের মত। এটাই জীবন। এর প্রতিটি অবস্থাকেই মেনে নিতে হয়।

যেমন আসে আমাদের দেহের পরিবর্তন তেমনি আসে আমাদের সম্পর্কের পরিবর্তন সময়ের সাথে সাথে। নিত্য পরিবর্তনের সাথে সবাইকেই খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে। সেটা মেনে নিয়েই এগোতে হবে। আজ কেউ তোমাকে ভালবাসছে বলে কালকেও যে একইভাবে ভালবাসবে তা নাও হতে পারে। সময়ের সাথে সাথে তাকেও তো পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। সেই পরিবেশ তাকে কতটা তোমার জন্য সমর্থন করবে সেটাও বুঝতে হবে বৈকি। আর তাকে মেনেও নিতে হবে। যত মানতে পারবে ততই শান্তি আসবে জীবনে। কখনো ভাববে না কি হতে পারত আর কি হল না। ভাববে যা পেয়েছি সেটাই ভালো আমার জন্যে।

এভাবেই প্রতিটি সম্পর্কের ওঠাপড়ার সাথে মানিয়ে নিতে হয়। যে অবস্থাই আসুক তাকে মেনে নিতে হয় ঈশ্বরের বরদান হিসেবে। ঈশ্বরের থেকে শুধু ভালোটাই নেবে আর মন্দটা নেবে না তা কি হয়? দুইই নিতে হয় ঈশ্বরের উপহার হিসেবে। তবেই তো শান্ত হতে পারবে। শান্ত হলেই তো জীবনে শান্তি পাবে। আর তুমি নিজে শান্তি পেলেই তো আশেপাশের মানুষকেও দিতে পারবে শান্তির পরশ।

৪/৭/২০১৩

জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রহসন

মহাকালের স্রোত চলেছে বয়ে। তারই ফলে গড়ে উঠছে নদীর এক পাড়, ভাঙছে আরেক পাড়। ভাঙছে পুরনো ইমারত, গড়ে উঠছে নতুন। সবই ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে, কাল নেই। কাল যারা ছিল সাথে, আজ তারা অনেকেই নেই, আজ যারা সাথে আছে কাল তারা অনেকেই থাকবে না। এটাই জীবন। তবু আমরা এই ক্ষণস্থায়ী খড়কুটো আঁকড়ে থাকতে চাই। জানি কিছুই থাকবে না, আমরাও থাকব না। তবু সবই আঁকড়ে থাকি। এটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রহসন।

৮/৭/২০১৩

রথযাত্রা

আজ রথযাত্রা। জগতের নাথ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। এই উপলক্ষ্যে জগন্নাথ মহাপ্রভু আজ আসবেন সকলের মাঝে। সকল সম্প্রদায়ের সকল ভক্তের সাথে আজ তাঁর রথে বিহার। এই রথে ভক্তদের সাথে শুধু যে স্বয়ং মহাপ্রভু জগন্নাথ থাকেন তাই নয়। সাথে থাকেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জ্যোতির্ময় শরীরে, থাকেন তাঁর সকল পার্ষদ। তাই রথযাত্রা আধ্যাত্মিক জগতের এক শ্রেষ্ঠ উৎসব। আসলে রথ তো আমাদের শরীরের রূপক। আমাদের উচিত — এই শরীর রূপ রথের সকল ভার মহাপ্রভুর কাছে সমর্পণ করে দিয়ে শরণাগত হয়ে এগিয়ে চলা এবং সকল কর্ম তাঁর কর্ম মনে করে নিস্পৃহ ভাবে ফলের আশা না করে কর্মযোগে প্রবৃত্ত হওয়া। তবেই তো সার্থক হবে জীবনের রথযাত্রা। আজ রথ উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই আমার শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থেক এবং জীবনের রথকে এগিয়ে নিয়ে যেও সঠিক দিশায়। জয় জগন্নাথ।

৯/৭/২০১৩

আসক্তি

আসক্তি হল যন্ত্রণার মূল কারণ। যন্ত্রণা, রাগ, ভয়, হতাশা, অসুখ সব আসে আসক্তি থেকে। যে বস্তু পরিবর্তনশীল তার উপর আসক্তি এলেই আসে যন্ত্রণা। এটাই স্বাভাবিক। এই পৃথিবীতে সবই পরিবর্তনশীল। প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। মানুষ পরিবর্তনশীল। যদি কখনো তোমরা নিজের ফেলে আসা দিনগুলির ছবি নিয়ে বস, দেখবে তোমরাও এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই চলেছ। বিগত দিনে তোমাদের কত আপনজন ছিল যারা আজকে সময়ের সাথে সাথে অনেক দূর হয়ে গেছে। আবার আজকে যারা তোমার কাছে আছে একদিন হয়তো এই সুত্র ধরেই তারাও চলে যাবে দূরে। ঋণানুবন্ধ শেষ হলেই সব শেষ। তাই আসক্তিতে নিজেকে বাঁধলেই যন্ত্রণা।

এর থেকে বাঁচার উপায় কি জানো? অতীতকে দেখো ইতিহাস হিসেবে যাকে তুমি পাল্টাতে পারবে না কিন্তু তার থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে এগোতে পারবে।

আর ভবিষ্যতকে দেখো এক রহস্যময় কাহিনী হিসেবে যেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া একটুও এগোনো যাবে না। এতে তুমি পরিকল্পনা অবশ্যই করতে পারো কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হবে কিনা তা ঠিক করবেন ঠাকুর। তাই অতীত ভবিষ্যত নিয়ে না ভেবে বর্তমানকে মেনে নাও ঠাকুরের উপহার হিসেবে। নিজেকে অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের কল্পনা থেকে যথাসম্ভব সরিয়ে নিজের বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনী একসাথে কর। এবার চোখ বন্ধ করে গভীর শ্বাস নাও। তারপর খুব ধীরে ধীরে সেই শ্বাস ছেড়ে দাও — এই ছাড়ার সময়ে চেষ্টা কর ১০ থেকে ২০ গুণতে। প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে এমনি করলে দেখবে মন অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। তখন স্থির হয়ে বসলে শুনতে পাবে তোমার নিজের শ্বাসের শব্দ। নিজের নিশ্বাসের এই শব্দই হল তোমার আত্মার স্বর। সেই স্বর যখনই জাগবে তোমার মধ্যে তখনই শুরু হবে আসক্তিকে কাটিয়ে ওঠার পালা।

১৫/৭/২০১৩

আশা

মানুষের জীবনে যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ আশা। আশা আছে বলেই জাগে পাওয়ার ইচ্ছা। আর পাওয়ার ইচ্ছা থেকেই আসে হারানোর ভয়। মানুষ যখন কারোর জন্য কোনো কাজ করে তখন সে আবার তার থেকে ফিরে পেতে চায় প্রতিদান। সবসময়ে সে যে তা পায় এমন নয়। যখনই পায় না তখনই তার মনে আসে অশান্তি। অর্থাৎ কিনা — চাওয়ার মধ্যেই আছে গলদ। আমরা যদি এই চাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারি তবেই আমাদের মধ্য থেকে যাবে হারানোর ভয়। আছে যত টেনশন সব নিতে যাবে পেনশন। ভেবে দেখতে গেলে — আমরা চাই কেন? যা আমাদের ভাগ্যে আছে তা তো এমনিতেই পাব। আর যা ভাগ্যে নেই তা কখনই পাব না। তবে কেন এত চাওয়া? কেন এত ফিরে পাওয়ার আশা? এখানে আমরা কর্ম করতে এসেছি, সেটি করে যাব। যা ফল পাওয়ার চাইলেও পাব, না চাইলেও পাব। তাই চাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ কর। তাহলে পাওয়ার পালা আপনা থেকেই শুরু হয়ে যাবে। আর মন ভরে থাকবে শান্তিতে।

১৬/৭/২০১৩

অহং থেকে মুক্তির পথ

আমরা অনেক সময়েই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি — আমাদের অহংকে দূরে সরিয়ে দাও। কিন্তু সাধারণ মানুষকে অহং থেকে মুক্তি একমাত্র দিতে পারে মৃত্যু। মৃত্যুর পরই যে কেটে যায় মায়ার বন্ধন।

কিন্তু জীবিত অবস্থায় যদি অহং থেকে মুক্তি চাই তবে আমাদের নিজেদের চেষ্টা করতে হবে। কারণ এই অহংকার ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। এর স্রষ্টা স্বয়ং আমরা— এই মান ও হুঁশ যুক্ত মানুষ। যখন আমাদের ধর্মপরায়ণতা, দয়া, মায়া, ভালবাসা, স্নেহ, প্রেম, জ্ঞান ইত্যাদির থেকে মন সরে যায় এবং আমরা অন্তরের সৌন্দর্যের পরিবর্তে বহিরঙ্গের সৌন্দর্যকে নিয়ে মেতে থাকি তখনই আমাদের পথ ভুল হয়।

যতক্ষণ আমরা এই বহিরঙ্গের নশ্বর বস্তুর মধ্যে নিজেদের সুখ খুঁজতে থাকব ততক্ষণ আমাদের কাছে ধরা দেবে শুধুই অসুখ। ফলে ভিতরে পুষ্ট হতে থাকবে আমাদের অসন্তোষ।

আর সেই অসন্তোষ থেকে যতই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করব আমরা বাইরের পথে ততই ক্রোধ, অবিবেক প্রভৃতি অসুর উৎপন্ন হতে থাকবে আমাদের ভিতরে অহংকারের সঙ্গী হিসেবে। কারণ বাইরের জগতে যা আছে সবই নশ্বর।

তাই এর থেকে মুক্তি পেতে হলে ডুব দিতে হবে নিজের মনের ভিতরে। নিতে হবে যোগের পথ। তা ছাড়া আমাদের তৈরী এই 'অহং' দানবের হাত থেকে পরিত্রাণের কোন পথ নেই।

১৮/৭/২০১৩

প্রারব্ধের থেকে আত্মরক্ষা

আমরা যখনই কারোর কাছ থেকে কোনো উপকার লাভ করি তখনই সেইসাথে তার কিছু প্রারব্ধও চলে আসে আমাদের মধ্যে। এটি প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাবা, মা, বন্ধুবান্ধব সবার উপকারের সাথেই তার কিছুটা প্রারব্ধ এসে যায় আমাদের মধ্যে। এই পৃথিবীতে কোন কিছুই বিনামূল্যে মেলে না। আমরা যখন অপরের দান গ্রহণ করি তার সাথে এই প্রারব্ধও টেনে নিই। এইজন্যে কখনো কারোর থেকে কোনো উপকার পেলে চেষ্টা করবে তার আরও বেশী উপকার করতে। সাধকরা বলেন — দিয়েই আনন্দ, নিয়ে নয়। তার কারণ এটিই। তাই আমাদের উচিত সবসময়ে খেয়াল রাখা যাতে ভুলেও কারো কাছে হাত পাততে না হয়। আর পাতলেও তা যথাসম্ভব দ্রুত যেন সুদে-আসলে শোধ করে দেয়া যায়। এইজন্যেই যুধিষ্ঠির বলেছিলেন — সেই সবচেয়ে সুখী যার কোনো ঋণ নেই। তাই সবসময়ে চেষ্টা করবে মানুষকে দিতে, আর্তের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে, সাধু সন্ন্যাসীর দেবা করতে — এর মধ্য দিয়ে তোমার প্রারব্ধ অনেকাংশে কেটে যাবে। আর চেষ্টা করবে কারো কাছ থেকে কিছু না নিতে, অপরের থেকে উপকার নেয়ার প্রবণতা এড়িয়ে যেতে। তাহলে অনেক অযাচিত প্রারব্ধের থেকে মুক্তি পাবে।

২১/৮/২০১৩

ক্রোধ

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে — ক্রোধ বলতে ঠিক কি বোঝানো হয়? শাস্ত্রে বলে — ক্রোধ হল চণ্ডাল। এক মুহূর্তের ক্রোধ শেষ করে দিতে পারে এক বছরের সাধনার ফল। তা এহেন ক্রোধ বস্তুটি কি?

এর উত্তরে বলি — মানুষের যখন কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণে বা কামনাপুরণে বাধা আসে তখন মনের ভিতরে যে জ্বালার অনুভূতি হয় এবং সেইসাথে এই সময়ে অপরের অনিষ্টের চিন্তায় মনের ভিতরে যে জ্বালার সৃষ্টি হয় তাকেই ক্রোধ বলে।

অনেক ছেলেমেয়েরা আমাকে বলে, "জানো, আমার বাবা মা খুব রাগী। আমাদের উপরে খুব রাগ করে।" এই রাগকে কিন্তু ক্রোধ বলে না, এটা হলো ক্ষোভ। কারণ বাবা বা মা মুখে যতই কটু বাক্য ব্যবহার করুন তাঁদের উদ্দেশ্য তো সন্তানের মঙ্গল। তাই তাকে ক্রোধ বলে না। কিন্তু যখন উত্তেজিত হয়ে অপরের ক্ষতি করা হয় এবং তাদের দুঃখ দিয়ে যখন মনে আনন্দ অনুভব করা হয় তাকে বলে ক্রোধ। তবে এই ক্রোধী ব্যক্তিরা কিন্তু এক অর্থে মানুষের মঙ্গল করে। এরা অন্যের মনে আঘাত দিয়ে নিজের পারমার্থিক অপকার করে পাপ সঞ্চ য়ের মাধ্যমে। ক্রোধের ফলে এরা যার অপকার করে তার কিন্তু পাপক্ষয় হয়ে যায়।

অর্থাৎ যারা আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চান তাদের কিন্তু ক্রোধ সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন — এই ক্রোধ হল মানুষের প্রথম শত্রু যা দেহে অবস্থান করে দেহেরই বিনাশ সাধন করে। যেমন কাঠে আগুন লাগলে তা কাঠকে জ্বালিয়ে দেয় তেমনই দেহে অবস্থিত ক্রোধরূপী আগুন মন তথা আত্মার সুপ্রবৃত্তিগুলো ভস্মীভূত করে। তাই ক্রোধ সম্পর্কে সাবধান।

১৮/৯/২০১৩

অশান্তি থেকে উদ্ধারের পথ

মানুষের জীবনে অশান্তির কারণ সংসার। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক হলেই মন অশান্ত হয়ে পড়ে... মনকে শান্ত করার জন্যে ঋষিরা তিনটি পথ বলেছেন — কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

প্রথমে আসি কর্মযোগের কথায় — কর্মযোগ হল ফলের আশা না করা ও কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করে নির্লিপ্তভাবে কর্ম করা। এতে সংসার থেকে আসক্তি চলে যায়। ফলে মনে শান্তি ও আনন্দ আসে। যাদের বুদ্ধি আছে তারা কর্মফল পরিত্যাগ করে জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন।

দ্বিতীয়তঃ আসছে জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগ দিয়ে আত্মস্বরূপে স্থিত হওয়া যায় এবং তাতে লাভ হয় অনন্ত আনন্দ। যে মানুষ অন্তরাত্মাতেই সুখযুক্ত এবং আত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত সেই জ্ঞানযোগী নির্বাণ ব্রহ্ম লাভ করেন।

তৃতীয়তঃ আসছে ভক্তিযোগ — এতে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন হয়। তাতে লাভ হয় প্রেম বা অনন্ত আনন্দ।

জ্ঞানমার্গের পথিকরা ভগবানের দর্শন চান না। তাঁরা আত্মস্বরূপ জেনে এবং তাতে প্রবিষ্ট হয়ে খুশী থাকেন। তাই তাঁদের আর ভগবান দর্শন হয় না। কিন্তু ভক্তিমার্গের পথিকদের লাভ হয় সবচেয়ে বেশী। তাঁদের ভক্তির জোরে আত্মস্বরূপ জ্ঞান হয়। তাঁরা আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠিতও হতে পারেন আর সেইসাথে তাঁদের ইষ্টদর্শনও হয় ; লাভ হয় অনন্ত প্রেম। তখন ভক্ত আর ভগবান প্রেমিক আর প্রেমাস্পদের মত এক হয়ে যান। এ প্রসঙ্গে শ্রীরাধার কথা বলা যায়। তিনি বলেছিলেন — শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের আগেই তাঁর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি হয়েছিল এবং দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার পর সেই অঙ্কুরিত অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে দিনের পর দিন ধরে। দেখতে দেখতে সেই প্রেম যেন দুজনের মনকে পেষণ করে অভিন্ন করে তুলেছিল। ফলে শ্রীরাধা তখন আর রমণী স্বরূপে আবদ্ধ ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণও আবদ্ধ ছিলেন না রমণ স্বরূপে। দুজনে একে অপরের সাথে মিশে এক হয়ে গেছিলেন ভক্ত ও ভগবান রূপে। এই তো প্রেমের শ্রেষ্ঠ উপহার। তাইতো শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম হল ভক্তিযোগের পরম নিদর্শন।

তাইতো বলি — প্রথমে কর্মযোগের মাধ্যমে নিজেকে সংসারের প্রতি নির্লিপ্ত কর আর তারপরে ঝাঁপ দাও ভক্তির সাগরে। জ্ঞানের সাগরেও ঝাঁপ দিতে পারো। তবে ভক্তিতে পাবে তাঁর লীলার আস্বাদ যা জ্ঞানে নেই। জ্ঞানী তো ব্রহ্ম সত্য

জগত মিথ্যা জেনে আত্মস্বরূপে স্থির হয়ে থাকেন পরম আনন্দে। ভক্ত এই আত্মস্বরূপে স্থিতির সাথে সাথে তাঁর পরম প্রেমিকের লীলার রসও আস্বাদ করেন।

তাইতো ভক্তিযোগের চেয়ে বড় পথ হয় না।

২০/৯/২০১৩

রাজসিক মানুষ ও তার বৈশিষ্ট্য

আজকে আমার একজন ভক্ত আমাকে অনুরোধ করেছিলেন রাজসিক ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখার জন্য। তাই আজকে তাঁর অনুরোধেই লিখছি রজোগুণের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে। যার মধ্যে রজোগুণ প্রবল থাকে তার মধ্যে ছয়টি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় —

১) তাদের মধ্যে থাকে খুব বিষয়ের প্রতি আসক্তি। আসক্তি রজোগুণের লক্ষণ।

২) তাদের আসক্তি থাকে কর্মফলে। তারা যে কাজই করুক তার ফল কামনা করে। কর্ম থেকে ইহলোকে যশ খ্যাতি এবং দেহান্তে স্বর্গে সুখভোগ কামনা করে।

৩) তাদের থাকে বেশী লোভ। তারা যতটুকু পায় তাতে কখনো সন্তুষ্ট হয় না। তারা চায় আরও বেশী।

৪) তাদের মধ্যে থাকে হিংসা। এই হিংসা তামসিক মানুষের মধ্যেও থাকে কিন্তু রাজসিকদের হিংসার প্রকৃতি অন্যরকম। তামসিক মানুষরা হিংসা করে নিজেদের অজ্ঞানের জন্যে কিন্তু রাজসিক ব্যক্তিরা হিংসা করে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। নিজেদের লাভের জন্যে তারা অপরের ক্ষতির পরোয়া করে না। এদের স্বভাবটাই হয় হিংসাত্মক।

৫) এদের মধ্যে থাকে অশুচিতা। অর্থাৎ তারা বস্তু সংগ্রহ করে ভোগের জন্যে। আর তাই তাদের সকল বস্তুই ভরে থাকে অশুচিতে। এদের দেহ-অস্থি-মজ্জা সব অশুচি হয়ে থাকে। যে স্থানে এই রাজসিক ব্যক্তিরা থাকে তাদের এই অশুচিতে কলুষিত হয়ে থাকে সেখানকার বায়ুমণ্ডল। ফলে এইসব লোকেরা যখন মারা যায় অতিরিক্ত আসক্তির জন্যে পৃথিবীর অশুচি স্থানেই এদের বাস করতে

হয় সূক্ষ্মদেহে।

৬) রাজসিক ব্যক্তিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল — জীবনের সফলতা ও বিফলতার সাথে আবেগ পরিবর্তন। তারা সুখে বেশী আনন্দিত হয় আর দুঃখে বেশী কাতর হয়। যারা সত্বগুণে সমৃদ্ধ হতে চান তাদের এই ছয়টি রাজসিক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ অত্যন্ত জরুরি।

২১/৯/২০১৩

তামসিক মানুষ ও তার বৈশিষ্ট্য

গতকাল লিখেছিলাম রাজসিক মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। আজকে লিখছি তমোগুণসম্পন্ন মানুষদের সম্বন্ধে। তামসিক মানুষের থাকে আটটি বৈশিষ্ট্য —

১) এদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল নির্বুদ্ধিতা। এরা বুঝতে পারে না — কি কাজ করা উচিত এবং কি কাজ করলে নিজেদের ক্ষতি হতে পারে। ফলে এরা কর্তব্য বা অকর্তব্যের মধ্যে ফারাক বুঝতে পারে না।

২) এদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল অভদ্রতা। এরা শাস্ত্রপথ ও সৎসঙ্গ করে না বলে এদের ব্যবহার শিক্ষারহিত হয়ে থাকে। কাদের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে এরা বোঝে না।

৩) এদের মধ্যে থাকে অনম্রতা। এদের শরীর, মন ও বাক্য হয় উদ্ধত।

৪) এরা জেদী হয়। অন্যের সুচিন্তিত মতামত কখনো গ্রহণ করে না। আর নিজের সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে মনে করে। শত প্রমাণ দিয়েও এদের কিছু বোঝানো যায় না।

৫) এরা অন্যের থেকে উপকার পেলেও কখনো তার উপকার করতে চায় না। বরং অপরের ক্ষতির জন্যে নিবেদিত প্রাণ থাকে।

৬) এরা অলস হয়। নিজেদের কর্ম করার পরিবর্তে শুয়ে শুয়ে অনর্থক চিন্তা করতেই ভালবাসে।

৭) এদের মধ্যে একটা বিষাদবোধ কাজ করে। যেহেতু এরা কোন ভালো কাজের সাথে যুক্ত থাকে না তাই এদের মধ্যে অবসন্নতা বোধ ও বিষাদবোধ কাজ করে। আর সেই বিষাদবোধ হয় অহেতুক। নেই কাজ তো খই ভাজ ধাঁচের।

৮) এদের মধ্যে একটা দীর্ঘসূত্রিতা কাজ করে। যে কাজ স্বল্পসময়ে শেষ করা যায় এরা সেটিকে ঝুলিয়ে রেখে দেয়। কোন কাজ সুচারুভাবে শেষ করতে চায়

না। এমনকি সহজ কাজও সহজে শেষ করতে চায় না।

যারা সত্বগুণসম্পন্ন হতে চান তাদের এই তামসিক বৈশিষ্ট্যগুলো এড়িয়ে চলা খুব প্রয়োজন।

২২/৯/২০১৩

সাত্ত্বিক ব্যক্তি ও তার বৈশিষ্ট্য

ইতিপূর্বে বলেছি রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে। এবার লিখছি সাত্বিক মানুষদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে।

সাত্বিক মানুষদের মধ্যে কোনো কাজের প্রতি আসক্তি বা কর্ম করার জন্যে অহংকার থাকে না। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে তাঁদের সব কাজ ঈশ্বরের মাধ্যমেই সংগঠিত হয় আর তাই সে কাজের কর্তৃত্ব নেয়াও অন্যায়। এমনকি তাঁরা ত্যাগ করতে অভ্যস্ত হলেও, অহংকার এড়িয়ে চললেও এবং কামনারহিত হলেও কখনো ভাবেন না যে তাঁরা ত্যাগী, নিরহংকারী বা নিষ্কাম ব্যক্তি।

সাত্বিক মানুষরা কখনো মনে করেন না যে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ বা তাঁদের মত কাজ কেউ করতে পারেন না। তাঁরা যা বলেন অন্তর থেকে, যা করেন বিবেকের প্রেরণায়। তাঁদের মধ্যে কোন মন আর মুখের প্রভেদ থাকে না। তাঁদের মধ্যে থাকে অসীম ধৈর্য্য। মানুষের জীবনে নানারকম বাধা বিঘ্ন আসে — সাত্বিক মানুষরা কিন্তু সকল বাধাবিঘ্ন সত্বেও শান্তভাবে ধৈর্য্য অবলম্বন করে থাকতে পারেন। সাফল্যে ভেসে যান না আবার দুঃখেও ভেঙে পরেন না। জীবনের সবকিছুতে সমদৃষ্টি থাকাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

সাত্বিক মানুষরা সবসময়ে সত্য কথা বলেন, মানুষের ভালোর জন্যে ভাবেন এবং নিজেদের সঁপে দেন সবার ভালোর জন্যে।

আধ্যাত্মিক পথে এগোতে হলে এই সাত্বিক গুণ অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন।

২৩/৯/২০১৩

আক্কেল তবে রাস্কেল নয়

মানুষের আজকাল আক্কেল নিয়ে ভারী সমস্যা। আক্কেল থাকলে লোকে বলে বুর্জোয়া। আর না থাকলে বোকা। আমাকে এতদিন দ্বিতীয় দলেই ফেলা হত। জাগতিক আক্কেল কোনকালেই নেই আমার। ইহকালে তো নেইই, পরকালেও হওয়ার আশা নেই। কিন্তু এহেন আমারই উঠল আক্কেল দাঁত। বছর আষ্টেক সেটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে অবশেষে তুললাম গতকাল। ডাক্তার আমাকে দাঁত তুলে দেখালেন — এটাই ছিল সেই আক্কেল দাঁত ; দেখতে লাগল অনেকটা জাহাজের মত, উপরে ভাঙা মাস্তুল তবে ভিতরে বেশ গভীর।

দাঁতটি দেখে কেমন বিরক্তি লাগল। এই একটা দাঁতের জন্যে এত কষ্ট সয়েছি এতদিন? দেখেই মনে হল — এই দাঁত তো আমার দেহের অঙ্গ ছিল, সেটা যখন দেহ থেকে বেরিয়ে গেল কোন খারাপ তো লাগল না। ব্যবহারের অযোগ্য ছিল বলেই ওটাকে বের করে দেয়া হল। তাহলে মৃত্যু নিয়ে আমরা এত ভাবি কেন? যখন শরীর অকেজো হয়ে যাবে শরীরটাকেও তো এমনিই ফেলে দিতে হবে। তখন শরীর থেকে বেরিয়ে ওটাকে দেখে আমরাও, অর্থাৎ আমাদের আত্মাও এরকমই বিরক্ত হবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। দেহ যতক্ষণ আছে কাজ করে যাও, দেহ অকেজো হলে বা তার কোন অঙ্গ অকেজো হলে সেটা বাদ দিয়ে দাও। যতদিন এভাবে বাদ দিতে দিতে চলে চালাও, তারপর একসময়ে পুরো স্থূল শরীরটাকেই বাদ দিয়ে বেরিয়ে পড় আপন সূক্ষ্ম শরীরে অনন্তের পথে।

২৯.১০.২০১৩

প্রকাশিত হল ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন গ্রন্থের 'নাসিক-শিরডি-দ্বারকা-প্রভাস' খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ

আজকে প্রকাশিত হল আমার 'ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন'' গ্রন্থের 'নাসিক-শিরডি-দ্বারকা-প্রভাস' পর্বের দ্বিতীয় সংস্করণ। শিব্রাম চক্রবর্তী বলতেন — লেখকের কাছে গ্রন্থ হল পুত্রসম আর গ্রন্থের সংস্করণ হল নাতি। যখন আমার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তখন ভাবিওনি একদিন এরকম আসবে যখন প্রায় প্রতি মাসেই একটা বা দুটো বই-এর সংস্করণ প্রকাশিত হবে। আজকে সেই দিন এসেছে যখন একটি বই-এর সংস্করণ হওয়ার সাথে সাথে আরেকটি বইকে পাঠিয়ে দিতে হয় প্রেসে। এসবই গোপালের কৃপা, তারামায়ের কৃপা। তাঁরাই আমায় দিয়ে লিখিয়েছেন, তাঁরাই সেই লেখা ছড়িয়ে দিচ্ছেন সব ভক্তদের মাঝে। ভক্তদের তথা পাঠক পাঠিকাদের ভালবাসাও তো তাঁদেরই কৃপা। আমি তো অতি অকীঞ্চ ন। তাই ঠাকুরকে দেয়ার মত আমার কিছুই নেই। আমার সবই যে তাঁর। এমনকি আমিও তাঁর। তাই আজকের দিনে তারামা ও গোপালকে জানাই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা। সেইসাথে সকল পাঠক পাঠিকাদের জানাই ধন্যবাদ। ১৯৯৬ থেকে বর্তমান ২০১৩ পর্যন্ত আমার লেখার প্রতি তোমাদের সবার যে অফুরন্ত ভালবাসা ও স্নেহ পেয়েছি সবই ঈশ্বরের করুণা।

৩১.১২.২০১৩

আজো গোপাল ঘটায় কত লীলা

আজকে বিশিষ্ট গায়িকা পাপিয়াদি আমায় ফোন করে শোনালেন তাঁর এক অভিজ্ঞতা। বৃন্দাবনে এক মহাত্মার আশ্রমে তাঁর দেখা হয় এক ভদ্রমহিলার সাথে। সাথে ছিল তাঁর মেয়ে ও তাঁর পাঁচটি গোপাল। তাঁকে দেখে পাপিয়াদি বলেন আমার লেখা বই 'বৃন্দাবনে আজ ঘটে অঘটন'-এর কথা। শুনে তো উনি যারপরনাই শিহরিত। আমার উল্লেখ শুনে পাপিয়াদিকে বলেন, 'আপনি তারাশিসকে চেনেন? তারাশিসের বই পরে যে আমার মেয়ের জীবনে কি অঘটন ঘটেছে কি বলব!' পাপিয়াদি মৃদু হেসে প্রথমে বলেন 'হ্যাঁ, তারাশিস আমার ছোট ভাই।' তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'কি অঘটন ঘটেছে আপনার মেয়ের জীবনে?'

তিনি বলেন, 'আমার মেয়ের নাম মুন্নি। দিল্লিতে থাকে। তারাশিসের বই পড়ে ওকে আমি দিয়েছিলাম গোপাল। আর তারপর ওকে 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' বইটা পড়তে বলি। বইটি ও কিছুতেই পড়ার সময় পাচ্ছিল না। আমিও তাগাদা দিতাম। অবশেষে একদিন ও বইটা পড়ল। সন্ধ্যা ৬টায় ধরেছিল, ভোর হওয়া অবধি বারবার পড়েছে। তারপর ৫ দিন আর অফিস যায়নি। শুধু ঘরে বসে কেঁদেছে আর বলেছে — "গোপাল যদি সুতপার সাথে এরকম করে তবে কেন আমার সাথে করবে না?" তারপর ও শুরু করল গোপালের মনপ্রাণ দিয়ে সেবা। আর সেইসাথে জেগে উঠল গোপাল। ওর ঘরেও শুরু হল গোপালের লীলা। তার একটি বলছি। একবার আমার জামাই traffic-এ আটকে যাওয়াতে flight miss করে। ও যখন বিমানবন্দরে পৌঁছেছে বিমান তখন ছেড়ে দিয়েছে। ও তখন ফোন করে মুন্নিকে বলল, 'তোমার গোপাল কোনো কাজের নয়। ফ্লাইট মিস করালো।' আশ্চর্যের ব্যাপার। সেই বিমান চলন্ত অবস্থায় থেমে গেল। সহসা বিমানবন্দরে তার নাম ঘোষণা শুরু হল। ওকে চলে যেতে বলা হলো রানওয়েতে এবং রানওয়েতে সিড়ি লাগিয়ে ওকে তুলে নিয়ে তারপর ছাড়ল বিমান। এমন কত কাণ্ড তার সাথে নিয়মিত হচ্ছে। তুমি তারাশিসকে অবশ্যই বোল আমার মেয়ে ও তার গোপালের কথা।"

পাপিয়াদি আজকে সন্ধ্যায় আমায় ফোন করে জানালেন এই লীলার কথা। আমি শুনে মুগ্ধ ও শিহরিত। গোপালের অঘটন এভাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনাই করি। জয় গোপাল।

১.১১.২০১৩

সিরিয়াল killer এবং সময়ের অপচয়

পৃথিবীতে সত্যিকারের killer বোধহয় tv সিরিয়াল। tv সিরিয়ালের কিল যে খেয়েছে সেই উপলব্ধি করবে এই কিল-মহিমা। সম্প্রতি আমার এক অল্পবয়েসী facebook ভক্ত আমায় মেসেজ দিয়ে প্রার্থনা করতে বলেছিল সতীর জন্যে যাতে তার গণেশকে রং করে যে ভাগীরথী অন্যায় করেছে সে যেন ধরা পড়ে। নাহলে সতীর যে সম্মান থাকবে না। শুনে তো আমি অবাক। কে এই সতী? আর ভাগীরথীই বা কে? অবশেষে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে এরা tv সিরিয়াল 'সতী'-র একেকটি চরিত্র। অর্থাৎ — এই সিরিয়াল মানুষের মনে কি প্রভাব ফেলেছে যে সতীর দুঃখে কাতর হয়ে একটি অল্পবয়স্ক মেয়ে আমায় মেসেজ দিচ্ছে তার হয়ে প্রার্থনা করার জন্যে।

আসলে এই সিরিয়াল হল মানুষের যথার্থ হত্যাকারী। সিরিয়াল killer এক কথায়। এরা মানুষের স্বাধীন ভাবনা চিন্তার শক্তি নষ্ট করে দেয় এবং নিজেদের কাহিনীর ঘোরপ্যাঁচে মানুষকে জড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ তাই ভাবে যা সিরিয়াল তাকে ভাবায়। সেইসাথে সময় যে কি পরিমাণে নষ্ট করায় তা বলাই বাহুল্য। ঘরে ঘরে মানুষরা এই সিরিয়ালের tension নিয়ে কাটায় সারাদিন আর দিনান্তে সব কাজ সেরে tvর সামনে হত্যে দিয়ে পরে থাকে তাদের পছন্দের সিরিয়ালের পরের পর্বটির জন্যে। (এর মধ্যে আধ্যাত্মিক সিরিয়াল যা আছে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, দেবো কি দেব মহাদেব এগুলো অবশ্যই লোকশিক্ষার কাজ করে। তাই আমার অভিযোগ এগুলির বিরুদ্ধে নয়। আমি সেইসব সিরিয়ালের কথা বলছি যা দৈনন্দিন সমস্যা এবং অনৈতিক কুশিক্ষার বীজ মানুষের মধ্যে ছড়ায়।) অর্থাৎ এক কথায় সিরিয়াল হল সময়ের বিরাট অপচয়।

আমাদের বোঝা দরকার যে সময় আমাদের হাতে খুব কম। যেটুকু আছে তার মধ্যেই জীবনকে নিয়ে যেতে হবে মহাজীবনের পথে। তাই সময় বাঁচাতে হবে। আমার কথা বলতে পারি। আমার নিজের ঘরে টেলিভিশন থাকলেও কেবল সংযোগ রাখিনি আমার ঘরে। কোনো সিরিয়াল আমি দেখি না। হ্যাঁ, ভালো ফিল্ম অবশ্য দেখি তবে তাও খুব কম — লেখার ফাঁকে বিনোদনের জন্যে। আর মূলত দেখি পুরনো দিনের ক্লাসিক বা ভক্তিমূলক ফিল্ম যার মধ্যে রুচিগত সৌন্দর্য্য খুঁজে পাই। ভক্তিমূলক সিরিয়ালের ডিভিডি কিনে রাখি অবসর মত দেখার জন্যে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, সাইবাবা, জয় শ্রীকৃষ্ণ, দেবো কি দেব

মহাদেব ইত্যাদি। ভালো হাসির বই-ও দেখি যা রসবোধকে ক্ষুরধার করে। কিন্তু নিয়ম করে tv-র সামনে যেতে রাজি নই। আগে ক্রিকেট দেখতাম। এখন তাও দেখি না কারণ ক্রিকেট আর এখন ভদ্রলোকের খেলা নেই ; ব্যাটিং-এর চেয়ে বেটিংই বেশী নিয়ন্ত্রণ করে ক্রিকেট। ফলে ক্রিকেটে আর আনন্দ পাই না। ফুটবলের বিশ্বকাপ অবশ্য চার বছর পর পর দেখি। তবে ফুটবলের উত্তেজনা আমাকে ছুঁতে পারে না। কারণ যেটুকু খেলা দেখি তা নিরপেক্ষভাবে — পছন্দের টিম বা দেশ জিতলে হাসি ; হারলেও দুঃখ পাই না। কারণ খেলা তো খেলাই — জীবন তো নয়। এক কথায়, নিজেকে কিছুর মধ্যে আটকাতে রাজি নই আমি। আমি কেন অন্য কিছুর প্রলোভনে নিজেকে আটকাব? কেন কিছু আমাকে তার term dictate করবে? আমি থাকব আমার সময়ের ও পছন্দের মালিক। আর সময়কে ব্যবহার করব জীবনের আসল প্রয়োজনে। কারণ আমাদের জীবনে সময় যে কম। বেলা যে বয়ে যায়। তাই সময়ের সদ্ব্যবহার খুব জরুরী।

৪.১১.২০১৩

বারবার এসেছি ফিরে তোমাদেরই টানে

কত হাসিকান্না, সুখ দুঃখের পথ পেরিয়ে এলাম বিগত লক্ষ কোটি বছরে। বিগত জন্মগুলিতে কত যোনীতে কতজনকে ভালোবাসলাম — কত আঘাত পেলাম, পেলাম কত সুখ। কতজন ভাঙল এই হৃদয়, কতজনের হৃদয় ভাঙল এই অধমের জন্যে — তারপর আবার আমরা হারিয়ে গেলাম একে অপরের থেকে। কিন্তু হারিয়েও কি হারালাম? ফিরে এলাম সবাই নতুন রূপে — পুরনো হিসেবটাকে মিটিয়ে দিতে। কারণ সেই ঋণানুবন্ধ — কারো সাথে হিসেব যে মাঝপথে রেখে পালিয়ে যাবার জো নেই। ফলে যতবারই আমি ফিরে আসি ততবারই পূর্ব জীবনের সেই সব সাথীদের সাথে দেয়া-নেয়ার ঋণের অনুবন্ধও মেটাতে হয়।

আজো নিত্য কত মানুষের সংস্পর্শে আসি। কত পাঠক পাঠিকাদের স্নেহ ভালবাসায় নিত্য অভিষিক্ত হই। কত সতীর্থ লেখক তথা অবিশ্বাসী নাস্তিক মানুষের বিরক্তির কারণও হই। তাদের কাউকে দেখে যেন মনে হয় — এতো অচেনা নয় ; যেন চিনি কতদিন ধরে। গোপালের সামনে প্রশ্ন নিয়ে যাই। তার মিটিমিটি হাসিতে পেয়েও যাই উত্তর।

বাবার কাছে শুনেছি — যাদের শেষ জন্ম হয় তাদের সাথে শেষ দেখার জন্যে বিগত জন্মগুলির অনেক প্রিয়জনই ফিরে ফিরে আসেন। আর বাবা আমার ছক দেখে বলেছেন যে এই আমার শেষ জন্ম। তবে বিগত লক্ষ কোটি জন্মে ভালবাসার সম্পর্ক তো কম জনের সাথে হয়নি। তাদের মধ্যে যাদের মুক্তি এখনো হয়নি তাদের অনেকের সাথেই দেখা হচ্ছে এই জন্মে। কেউ ছিলেন আমার মা, কেউ বাবা, কেউ ভাই, কেউ বোন, কেউ প্রেমিকা, কেউ স্ত্রী, কেউ দাদা, কেউ দিদি, কেউ বা সন্তান, কেউ বা নাতি। তাদের সবার সাথেই এভাবেই বইয়ের মাধ্যমে হচ্ছে ফিরে দেখা। আধ্যাত্মিক পথে আমার কাজ তো একজনকে নিয়ে নয়, অনেকজনকে নিয়ে — তাই হয়তো তাদের সবার সাথেই হচ্ছে এই ফিরে দেখা — নানা রূপে নানা দেহে আসছেন তারা। তাদের সাথে কথা হলে বা ফেসবুকে বা ফোনে বা ই-মেলে মেসেজ আদানপ্রদান হলেও হয়তো তাই মনটা ভরে যায় আনন্দে।

বাবার কাছে এও শুনেছি — শেষ জন্মে পূর্বজন্মের শত্রুরাও আসে ফিরে। তাদের যেটুকু আঘাত দেয়ার বাকি ছিল সেটুকু দিয়ে ঋণমুক্ত করে যায়। তাই এই জন্মে তাদের দেখাও কম মেলে নি। তবে আঘাত পেলেও আজ আর কাঁদি না। কারণ জানি — এই আঘাতে কাটছে আমার প্রারব্ধ ; মিটে যাচ্ছে পূর্বজন্মের ঋণ।

দেহ তো বারবার শেষ হয়ে যায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর। কিন্তু আত্মার তো বিনাশ নেই। তাইতো তাকে ফিরে ফিরে আসতে হয় পৃথিবীর বুকে — কে জানে এই ভালবাসার মানুষগুলোর টানই বোধহয় বারবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আমিও কতবার এসেছি এভাবে। তোমরা যারা আমার লেখা পড়ছ এখন তারাও অনেকেই যে পূর্ব পূর্ব জীবনেও আমার সঙ্গে ছিলে ওতপ্রোতভাবে তা অনুভবে বেশ বুঝি। হয়তো তাই বই-এর সূত্রে জন্মান্তরের সম্পর্ক আবার দেখা দিচ্ছে নতুনভাবে। মনে পড়ে যাচ্ছে সুমনবাবুর সেই গানটি —

'অমরত্বের প্রত্যাশা নেই, নেই কোনো দাবি দাওয়া,
এই নশ্বর জীবনের মানে শুধু তোমাকে চাওয়া।'

তোমাদের সবার ভালবাসার নানা রূপ তো ঈশ্বরের দান। তাই তোমাদের কাছে তাঁর অমৃতের বার্তা পৌঁছে দেয়ার মাঝেই সার্থক আমার আসা। জানি না কে সেটা অমৃত ভেবে নিল আর কে তা গরল ভেবে সরিয়ে দিল। তবে আমার কাজ ছড়িয়ে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাকিটা তো ঠাকুরের কাজ। তিনিই সেদিকটা দেখছেন ও দেখবেন।

১০.১১.২০১৩

প্রকাশিত হল আমার "শ্যামের মোহন বাঁশি" বইটির তৃতীয় সংস্করণ

আজকে প্রকাশিত হল আমার 'শ্যামের মোহন বাঁশি" বইটির তৃতীয় সংস্করণ। এই বইটি আমাদের আশ্রমের গোপালসোনার কীর্তিকলাপের উপর লেখা। গোপালের লীলাসমূহ নিয়ে লেখা এই বইটি আমার, বাবার, মায়ের, দিদিমার ও আরো অনেক ভক্তের অভিজ্ঞতার সংলকন। গোপালসোনার দুষ্টুমির মধ্য দিয়েই যে জাগে বাঁশীর সুর — তার কাছে যাবার আহ্বান বেজে ওঠে বাঁশীর তানেই। ছোটবেলা থেকে গোপাল আমার ভাই, বন্ধু, সখা সব। তার সাথেই যে বেঁধেছি প্রাণের ডোর। তাইতো এই বইটি আমার কাছে বিশেষ একটি প্রিয় লেখা। আমার প্রিয় লেখা যে আমার পাঠক পাঠিকাদের ভালো লাগছে এই বইটির তৃতীয় সংস্করণ তার প্রমাণ। ২০১০ সালে এটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২০১৩ সালের মধ্যে তিনটি সংস্করণ স্পষ্টই বুঝিয়ে দিচ্ছে গোপালের কীর্তিকলাপে পাঠক পাঠিকারা কত মুগ্ধ। তাই আজ এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশনার পর গোপালকে জানাই আমার অন্তরের ভালবাসা। আর সেইসাথে আমার পাঠক পাঠিকাদেরও জানাই আমার কৃতজ্ঞতা — আপনাদের / তোমাদের সবার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা সবসময়েই আমার চলার পথের পাথেয়। আশা করব — আপনাদের / তোমাদের এই ভালবাসার শুভেচ্ছা চিরকাল থাকবে আমার বইগুলির সাথে।

২২.১১.২০১৩

দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধার

আজকে কালীঘাটের কালীমন্দির থেকে অটোতে ফিরছিলাম। ড্রাইভারের পাশে সামনের সিটে বসে। রাসবিহারী অতিক্রমের পর আমি যে অটোতে বসে ছিলাম সেটিকে সহসাই একটি মারুতি গাড়ির পছন্দ হল। আমার পা যথারীতি একটি বাইরে ছিল এবং অন্যটি ভিতরে। আকস্মিকভাবেই গাড়িটি দ্রুত অটোর দিকে ছুটে এল আর একদম অটোতে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর ঠিক সেই

মুহূর্তে আমার যেই পা বাইরে ছিল সেটি কে যেন টেনে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল— স্পষ্ট অনুভব করলাম। ফলে গাড়িটার স্পর্শ আমার পা ছুঁয়ে গেলেও হাঁটুর উপর আঘাত লাগল না। একটা নিশ্চিত বিপদ থেকে বেঁচে গেলাম। মন্দির থেকে ফিরছিলাম। আর বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ে "দোহাই মা চণ্ডী, শ্রী দূর্গা জয়তারা" বলে বেরিয়েছিলাম। তাই হয়তো এত সহজেই দুর্ঘটনা এড়ানো গেল। জয় মা কালী। জয় গোপাল।

১০.১২.২০১৩

বিদায় ২০১৩

২০১৩ আজকের দিনে নিচ্ছে বিদায়। এই বছরে আমরা হারালাম কত কিছু, পেলামও অনেক।

ব্যক্তিগত দিক থেকে বলতে গেলে এই বছরে আমার দুটি বই প্রকাশিত হল— "মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা" এবং "অনন্তের জিজ্ঞাসা"। লেখা হল "কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন" এবং আমার অল্পবয়সে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা গল্পের সংকলন "যেথা রামধনু ওঠে হেসে" বইটির কাজ সারলাম। তাই লেখার দিক দিয়ে বছরটা আমার ভালই গেছে। এই বছর ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হল আমার ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে নিজস্ব আধ্যাত্মিক অধিবেশন যা আমার পাঠক পাঠিকাদের নিয়ে আলোর লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার পথের একটি বিশেষ ধাপ। (এই অধিবেশন কোন নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা দিনে হবে না। যখন হবে ফেসবুকে বা SMS-এ আগ্রহী ভক্তদের জানিয়ে দেয়া হবে) সেইসাথে এই বছর আধ্যাত্মিক জগতের জন্য সৃষ্টি করলাম আমার একান্ত ভক্তদের নিয়ে 'শরণাগত সম্প্রদায়।' একদিন এই সম্প্রদায় অনেক মানুষকে আলোর পথ দেখাবে— এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সৃষ্টি হয়েছে অমিত ভট্টাচার্য্যর মাধ্যমে 'তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ফ্যান ক্লাব'। এসবের মধ্য দিয়ে অন্যান্য বছরের মত পেয়েছি পাঠক পাঠিকাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা।

আধ্যাত্মিক দিক থেকে এই বছরে পেয়েছি একজন বিরাট গুপ্তযোগীর সান্নিধ্য যিনি আমাকে যোগের কিছু বিশেষ ক্রিয়া দিয়ে গেছেন কৃপা করে — কালীঘাটে লাভ করেছি তাঁর এই বিরাট কৃপা যা আমাকে আমার চলার পথে অনেকটাই

এগিয়ে দিয়েছে। আলাপ হয়েছে প্রভা সেনের সাথে যার মাধ্যমে পেয়েছি কেদারনাথের বুকে ঘটে যাওয়া প্রলয়ের সময়ে গোপালের এক অপার্থিব লীলার খবর। সেইসাথে পেয়েছি অনেক নতুন মানুষের দেখা যারা বন্ধু হয়ে, বোন হয়ে এবং ভাই হয়ে এসেছে আমার জীবনে। সবার মাধ্যমে পেয়েছি না জানি কত জন্মের কত আত্মার আত্মীয়ের দেখা। আবার হারিয়েও গেছে কেউ কেউ যারা একসময়ে ছিল খুব কাছের। জীবন যে হারানো আর পাওয়ার মিলনমেলা।

তবে এই বছর আমাকে অনেক দিলেও কেড়েও নিয়েছে অনেক কিছু। কেদারনাথে মানুষের অত্যাচারে প্রকৃতির বুকে নেমেছে বিরাট ধবংস — হারিয়ে গেছে কত হাজার প্রাণ। হিমালয়ের পথের প্রতিটি যাত্রীই আমার খুব কাছের মানুষ যেহেতু আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি যে হিমালয়ের সাথে রয়েছে আমার আত্মিক যোগ। তাই এই বিরাট লোকক্ষয় আমাদের কাছে এক চেতাবনী হয়েই রইল। এই বছরে আমরা হারিয়েছি অভিনেতা প্রাণ, ফারুক শেখ ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষের জন তো আমার এক বই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আনন্দলোকে উপস্থিত ছিলেন এবং আমার বই-এর ব্যাপারে ভাষণ দিয়েছিলেন। এছাড়া আমার প্রিয় শিল্পী মান্না দে আর শামসাদ বেগমের কথাও বলতে হয়। বিশেষতঃ মান্না দে-র পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া যে সঙ্গীতজগতের এক বিরাট ইন্দ্রপতন। তাঁর গান চিরকালই আমার খুব প্রিয়।

ব্যক্তিগত হারানোর দিক থেকে বলতে গেলে, এ বছর আমাদের আশ্রমের বিশেষ ভক্ত লীলাপিসীও মারা গেছেন যিনি ছোটবেলা থেকেই আমার প্রতিটি প্রকাশনার অশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন।

এভাবেই কেটে গেল ২০১৩ — কিছু পেলাম, কিছু হারালাম। সব মিলিয়ে জীবন থেকে ঝরে গেল একটি বছর। শুধু সঞ্চয় হয়ে রইল স্মৃতি আর এ বছরে রোজ করে যাওয়া মন্ত্র জপের অনুরণন যা মৃত্যুর পরেও আমার সঙ্গী থাকবে চিরকাল। এভাবেই কেটে যাবে আরও কিছু বছর আরও কিছু হারানো আর প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে। তারপর দেখতে দেখতে একদিন এই শরীরটাও যাবে হারিয়ে — অনন্তের ঘরে ফিরে যাব পরম আনন্দভরে ; শুধু খেয়াল রাখতে হবে সেখানে যাওয়ার সময় এই ভবের হাট থেকে যেন খালি হাতে ফিরতে না হয়।

৩১.১২.২০১৩

ধ্যান

ধ্যান কাকে বলে? নিজের সত্বায় ফিরে যাওয়ার উপায় হল ধ্যান। আমাদের আসল সত্বা অসীম অনন্তর অংশ। তাকে নিজের মধ্যে অনুভব করাই ধ্যান। একটি সহজ উপায় বলি ধ্যানের জন্যে। প্রথমে একটি কম্বলের আসনে বস মেরুদণ্ড সোজা করে। হাত রাখো চিনমুদ্রায়। দু চোখ বন্ধ কর। নিজেকে প্রথমে মনিপুর চক্রে অর্থাৎ নাভিতে কল্পনা কর। নিজের আত্মার স্থূল আবরণ হিসেবে চারপাশে যে মাংসের শরীর আছে তা ভিতর থেকে কল্পনা কর। দেখ মাথার শিরোভাগে আছে মস্তিষ্ক। আর পিছন দিকে আছে মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি। ধড়-এর মধ্যে আছে হৃদযন্ত্র, যকৃত, পাকস্থলী প্রভৃতি। তার মাঝের যে শূন্য অংশ সেখানে অনুভব কর নিজের সূক্ষ্ম শরীর। তার মধ্য দিয়ে একটি milky way বা আলোর পথ উঠে গেছে উপরপানে। দেখতে থাক মনের চোখে — এর মধ্যেই আছে সৌর বিশ্ব। এর মধ্যে তোমার চোখ দুটি যেন সূর্য্য, চন্দ্র। উপলব্ধি কর সব প্রাণীর প্রতি ভালবাসা তোমার হৃদয়ে। নিজের দেহের cell গুলো অনুভব কর নদীর মত, তোমার ত্বক মনে কর আকাশ, দেহের হাড় মনে কর পাহাড়। নিজেকে বল — তোমার মন হল সকল প্রাণীর মনের মিলনস্থল, তোমার হৃদয় সকল প্রাণীর হৃদয়ের মিলনস্থল এবং তোমার ভালবাসা সকল প্রাণীর ভালবাসার মূর্ত রূপ। তারপর শুরু কর মনের উড়ান। মনের চোখে দেখতে থাক — তোমার মধ্যেই আছে সমস্ত সৌরবিশ্ব, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ তারা।

এবার নিজেকে অনুভব কর অনাহত চক্রে যেখানে আসন পেতে বসে আছ তুমি আত্মা। তোমার সামনে একটা আবছা আবরণ। তার মধ্য দিয়ে একটি সোনালী রঙের সুড়ঙ্গ চলে গেছে সামনের দিকে — প্রশস্ত এই সুড়ঙ্গ। তার মধ্যে দিয়ে উড়ে যাও তুমি উপরপানে দূরে — আরও দূরে। চোখ বন্ধ করে কল্পনা করতে থাক যেন তুমি উড়ে যাচ্ছ অনন্ত মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে। অনেকটা দূর যাবার পর দেখবে এই সোনালী জ্যোতিতে পরিপূর্ণ সুড়ঙ্গ যেখানে শেষ হচ্ছে সেখান থেকে একটি নীল সুড়ঙ্গ এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। এটি আগেরটির তুলনায় আয়তনে অর্দ্ধেক। এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাও আরও হাজার হাজার মাইল। যেখানে এই নীল সুড়ঙ্গ শেষ হচ্ছে সেখানে দেখবে একটি বিরাট রূপোর দ্বার। সেটি বন্ধ। তার সামনে গিয়ে নিজের ইষ্ট দেবতার কাছে প্রার্থনা করবে — ঠাকুর আমাকে তোমার কোলে টেনে নাও জ্যোতির মাঝে।' তারপর অনুভব কর সেই দরজাটি

খুলে যাচ্ছে এবং ভিতরের জ্যোতির মাঝে মিশে যাচ্ছ তুমি। এই জ্যোতির মাঝেই ডুবে থাক যত ক্ষণ মন চায়। যখন ফেরার প্রয়োজন হবে তখন "ঠাকুর আমি এবার আসি" বলে সেই রূপোর দরজার মধ্যে দিয়ে প্রথমে নীল সুড়ঙ্গ ও তারপর সোনালী সুড়ঙ্গ কল্পনা করে তার মধ্যে দিয়ে ফিরে এস অনাহত চক্রে। তারপর চোখ খুলো। প্রতিদিন রাতে ঘুমোনোর আগে বিছানায় বসে ১০ মিনিট এই ধ্যান করার চেষ্টা কর। দেখবে জীবনে এক নতুন আনন্দ অনুভব করবে। আজ ২০১৪ সালের প্রথম দিন আমার "শরণাগত সম্প্রদায়"- এর ভক্তদের জন্যে দিলাম এই ধ্যানের পাঠ। সবার মঙ্গল হোক।

১.১.২০১৪

'কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন' গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু পাঠক-পাঠিকার মন্তব্য

বিন্তি বণিক ঃ তোমার "কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন" বইটি পড়লাম। কি যে পরিতৃপ্তি আর আনন্দ পেলাম বোঝাতে পারব না। কেদারনাথের ভয়াবহ ধবংসের কারণগুলোর তুমি যে সুন্দর বৈজ্ঞানিক, বাস্তববাদী তথা আধ্যাত্মিক চুলচেরা বিশ্লেষণ নিরপেক্ষভাবে করেছ, তা এক কথায় অনবদ্য। এরপর আর কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না এই অঘটনের। একদম শেষ সীমার শেষ মাইলস্টোনের মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছ তোমার বইকে। কেদারনাথের মতো পবিত্র ধামে এই দুর্ঘটনায়, সকলের মনে জেগেছে যে স্বাভাবিক প্রশ্নগুলো, যেমন তীর্থযাত্রায় এসে এমন দূর্গতি কেন হল? কেন কেদারনাথ তাঁর ভক্তদের রক্ষা করলেন না? যাঁরা মারা গেলেন তাঁরা সকলে তো অনাচারী না, তাহলে তাঁদের কেন এমন হাল হল? এক তীর্থযাত্রায় যারা বাঁচলেন তাদের এমন পৃথক ফল কেন হল? তারা সকলে তো আর ভক্ত নন, ইত্যাদি আরো বহু প্রশ্নের অপূর্ব তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। অনেক প্রশংসা দাবী করে তোমার দৃষ্টিভঙ্গীর। প্রভার সঙ্গে তার গুরুদেবের প্রথম দেখা থেকে দীক্ষা নেওয়া অবধি প্রতিটি কথোপকথন সোনা দিয়ে মুড়িয়ে রাখলেও কম হয়। আত্মজ্ঞান লাভের উপায়, সদ্-গুরুর গুণাবলী, গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা, ঈশ্বর তত্ত্বের চেয়ে গুরু তত্ত্ব বড় কেন, সাধনায় সিদ্ধি র জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ কি একমাত্র পথ, ঈশ্বর দর্শন কখন কিভাবে হয় ইত্যাদি অধ্যাত্মবাদের নানান নিগূঢ় প্রশ্নের উত্তর কি সহজ-সরল-সাবলীল ভাবে

প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরেছ তোমার সুচারু লেখনীর মাধ্যমে। অভাবনীয়! আবার জপের পদ্ধতির গোপনীয় কথাও অবলীলায় লিখে পাঠককুলকে সমৃদ্ধ করেছ। আর মহাভারতের রূপক বর্ণনা তো অদ্ভুত তাৎপর্যপূর্ণ। অনির্বচনীয়! আর সেই সাথে তোমার অলক্ষ্যে গল্পে ধরা পড়েছে তোমার কোমল-স্নেহপ্রবণ, উদার মন। তোমার লেখা আর মনের প্রশংসা ঠিকঠাক করতে গেলে কয়েক পাতার পুস্তিকা হয়ে যাবে।

প্রার্থনা করি, অনন্তের খোঁজের যে পথের সন্ধান তুমি দিতে চাও, তা যেন প্রতিটি পাঠক পায়। আর আমার রাধামাধবের কাছে প্রার্থনা করি তোমার এই বইয়ের ব্যাপকার্থে প্রচার, যাতে হিমালয়ের অনুচ্চারিত যে মর্মবেদনা তুমি সকলকে অনুভব করাতে চাও, তোমার সেই প্রয়াস যেন সার্থক হয়। সফল হোক তোমার মনোকামনা। তুমি যথার্থই হিমালয়-প্রেমী।

আদৃজা পাল ঃ দাদা তোমার বই পড়ার এক আলাদা তৃপ্তি পাই আমি বাসে উঠে, যেখানে অনেক মানুষের কোলাহল থাকে কিন্তু আমি যে তোমার বই সাথে থাকলেই seat পেয়ে যাই আর সেটি পড়া শুরু করা মাত্রই চারপাশ নিঃস্তব্ধ হয়ে যায় আমার জন্যে। আর ঠিক এভাবেই গত স্ট্রাইকের দিন তোমার বই হাতে পেতেই আমি পরদিন বাসে যাওয়ার সময়ে পড়া স্টার্ট করি কারণ বাড়ি ফিরে আর পড়া হয় না। তবে আজ বাসে জ্যামে দু'ঘন্টা আটকে থাকাতে আমার বেশ অনেকটা এগিয়ে গেল পড়া। বই পড়ার আগে শুধু মা একটাই কথা বলেছিল যে পড়ার সময় বুঝে পড়বি। আর তাই আজ বাড়ি ফিরে থাকতে না পেরে সাতটা থেকে দশটার মধ্যে পড়া শেষ করে ফেললাম আর তাতে এটাই বলি তোমার এই বই-এ লেখাটা অনেকটাই আলাদা রকম। পড়ে এক আলাদা তৃপ্তি আর অনুভূতি হয়েছে। প্রত্যেকটা লাইনের সাথে সাথে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে আমার। তোমার এই বই আর তোমার সব বই অনেক অনেক মানুষের মাঝে পৌঁছে যাবে দাদা আর সে যে বিরাট সাফল্য হবে। তোমার হাত দিয়ে গোপাল যে কত লীলাই না করেছে। আমি খুবই আনন্দিত যে আমি তোমায় পেয়েছি কাছে দাদা হিসেবে। দাদা বইটি যে কত ভালো হয়েছে আমি বোঝাতে পারব না। প্রণাম নিও।

ডাঃ শুভাশিষ গাঙ্গুলি ঃ এই কিছুক্ষণ আগে পড়া শেষ হল 'কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন'। পড়া শেষ হলে নির্বাক হতে হয়। প্রথম থেকে স্মৃতির পাতা আঁকড়ে ধরে মন এর ছত্রে ছত্রে কিছু খুঁজতে থাকে। কি হবে ঈশ্বরের কাছে জাগতিক চাওয়া-পাওয়া আর হিসেব মেলানো! এই মূল্যবান অর্ঘ্যটি আমাদের হাতে তুলে

দেওয়ায় আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। আপনার প্রত্যেকটা বই এর মত এটাও এত সাবলীল ও সুখপাঠ্য যা বলার অপেক্ষা রাখে না! পড়তে পড়তে আনন্দের শিহরণ, আনন্দাশ্রু, একটা ভীষণ ভাল লাগা, একটা বিরাট আশা-ভরসা আর ভিত আরো মজবুত হওয়া। অসাধারণ! গোপালসোনা আপনার ওপর আরো আরো কৃপা করে আমাদের মত সাধারণ মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে উঠুক! জয় বাবা কেদারনাথ! জয় গোপাল সোনা!

তানিয়া চক্রবর্তী ঃ দাদা কাল রাত ৯টা থেকে রাত ২.৩০ অবধি এক নিঃশাসে বইটা পড়ে শেষ করলাম। তোমার 'শ্যামের মোহন বাঁশী' আর 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন' পড়ে চোখে জল এসে গেছে। কাল এই বইটি পড়েও কেঁদে ফেলেছি। খুব ভাল হয়েছে দাদা। কতটা ভালো, ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তুমি দেখ দাদা স্বয়ং গোপাল এই বই-এর নেপথ্যে আছে, এই বই বিরাট সাফল্য পাবে। ধারী দেবীর বর্ণনা, গোপাল সোনার কাছ থেকে সন্ন্যাসীর আদেশ পাওয়া, প্রভার দীক্ষা পাওয়া প্রতিটা ব্যাপার মন ছুঁয়ে গেছে। তার সাথে মনে উত্তরাখণ্ডের disaster-এর ব্যাপারে মনে জমে থাকা বহু প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে গেছি।

১৬.১.২০১৪

সাধনপথে চলতে হলে

আমার কাছে এসে অনেকেই দীক্ষা চায়। কিন্তু আমি তাদের বলি — সাধনপথে চলতে হলে প্রথমেই দীক্ষা হবে না। আগে দীক্ষার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। নিজেকে তৃণাদপি ক্ষুদ্র মনে করতে হবে। মনকে ইচ্ছাশূন্য করতে হবে এবং অহংকারমুক্ত করতে হবে। মনকে কোনকিছু নিয়ে তামাশা করা বা অলৌকিক magic দেখার বাসনা থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। সেইসাথে শাস্ত্রপাঠ, সৎ গ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ করে যেতে হবে যত সম্ভব। ধরা যাক — মনে কোন কিছুর উপর লোভ এল। হয়ত ইচ্ছা জাগল — এখন কিছু রসনার তৃপ্তির জন্যে খেতে হবে। তখনই চেষ্টা করবে লোভ সামলানোর। খাও পরিমিত। কথা বল কম। যেটুকু বল সত্যি বল। মনে কিছু নিয়ে জল্পনা কল্পনা কোর না। আর কখনোই মনে করবে না তোমার কিছু দরকার কারণ তোমার যা দরকার তা তোমার চেয়ে বেশী ভালো জানেন ঠাকুর। তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

এই জায়গাগুলো আয়ত্ত করার জন্যে নাম জপ খুব কাজে দেয়। তাই আমি

তাদের বলি — রাতে নির্জন ঘরে বা ঘরের নিরালা কোণে নিজের পছন্দের ইষ্টনাম পারলে রাত চারটায় উঠে (হয় স্নান করে আর নাহলে শয্যাশুদ্ধি করে) অন্তত এক বছর জপ কর। যখন এভাবে জপ করতে করতে মন স্থির হয়ে আসবে তখন যথাসম্ভব শ্বাস কুম্ভক করে চোখ বন্ধ রেখে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে তার মাঝে মন নিবিষ্ট করে জপ কর। তারপর শুধু তাঁর শ্রীচরণে শরণ নিয়ে মন্ত্র জপ কর। তাতেই সব হবে। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধ রাতে জপের পর ভ্রামরী প্রাণায়াম করে কানে আঙুল দিয়ে শুনতে পারো — তাতে ঝিল্লি, বাঁশী, মেঘগর্জন, ঘন্টা, কাঁসা, ভেরী, তুরী এরকম নাদ শুনতে পাবে। তারপর বীজমন্ত্র পেলে সহজেই কাজ দেবে। সেইসময়ে শুধু চেষ্টা করতে হবে মন যাতে আজ্ঞাচক্রে বা তার উপরে থাকে। এভাবে যোগে বসে জিভকে তালু মূলে রেখে বীজমন্ত্র জপ করলে প্রথমে শোনা যাবে প্রণব ধ্বনি আর তাতে মন নিবিষ্ট করতে পারলেই আসবে সমাধী।

৩০.১.২০১৪

সাধনপথে চলতে হলে (২)

অনেকেই আমাকে বলে — সংসারের সব কাজ সেরে আর সময় পাই না ঠাকুরকে ডাকার। উত্তরে আমি বলি — সংসারের সব কাজের জন্যে সময় মিলছে অথচ সেই কাজের কোনো ফল সঙ্গে যাবে না এটা তোমাদের জানা আর তা জেনেও যে কাজের ফল সঙ্গে যাবে তার জন্যে সময় নেই? আমি জোর দিয়ে বলি — যেমন করে হোক, যেভাবে হোক জপ করবে। ২৪ ঘন্টায় অন্তত ৯০ মিনিট জপের জন্যে দাও। তাও না পারলে অন্তত এক ঘন্টা। ধর তোমার কোনো প্রিয়জন বিদেশে আছে, সেক্ষেত্রে কি হয়, সব কাজ করলেও মনটা পড়ে থাকে তার কাছে। ভগবানকেও সেভাবে ভাবতে হয়। সেইসাথে প্রতিরাতে শোবার সময়ে নিজের সারাদিনের সব কাজ — ভালো মন্দ সব সমর্পণ করবে ঠাকুরকে আর বলবে আমার সব তুমি নাও আর সব নিয়ে আমাকে তোমার করে নাও।

সেইসাথে শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ বা যারা বীজমন্ত্র পেয়েছ জপ করে যাও। ব্যস, তাতেই হবে। নাম নামী যে অভেদ। এটুকু করলেই তাঁর কৃপা অন্তরে পাবে। আর কিছু না করলেও জ্ঞান জেগে উঠবে অন্তরে আপনা থেকেই।

৩১.১.২০১৪

এই লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

✪ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে (মূল্য - ৭০/-)

(দেহ থেকে দেহাতীতে গিয়ে এক সিদ্ধ ক্রিয়াযোগীর পরলোকের বিভিন্ন স্তরদর্শন ও দিব্যদেহধারী মহাত্মাদের সাথে কথোপকথনের এক চমকপ্রদ সত্যনিষ্ঠ বিবরণ)

✪ দেবলোকের অমৃতসন্ধানে

১। ***যমুনোত্রী - গঙ্গোত্রী - গোমুখ পর্ব*** **(মূল্য - ৭০/-)**

২। ***বাসুকীতাল - কালিন্দী খাল - বদ্রীনাথ পর্ব*** **(মূল্য - ৭০/-)**

৩। ***পঞ্চ বদ্রী - পঞ্চ প্রয়াগ - পঞ্চ কেদার পর্ব*** (মূল্য - ৯০/-)

৪। ***নেপাল পর্ব*** **(মূল্য - ৭০/-)**

(বাংলার ভ্রমণসাহিত্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি । ঐশীলীলার পরম পীঠস্থান গাড়োয়াল হিমালয়ের ও নেপাল হিমালয়ের পথে পথে লেখকের জাগতিক তথা মহাজাগতিক অভিজ্ঞতার রসসিক্ত বিবরণ। সেইসাথে গাড়োয়াল ও নেপাল হিমালয়ের প্রতিটি তীর্থের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক তথা পৌরাণিক প্রেক্ষাপটের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের আধ্যাত্মিক তথা জাগতিক সৌন্দর্য্যের রূপ সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে ভ্রমণকাহিনীর আঙ্গিকে)

✪ অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান (মূল্য - ৬০/-)

(লেখক ও তাঁর পরিচিত প্রিয়জনদের জীবনে অতীন্দ্রিয় জগতের আত্মাদের আগমন এবং তাদের মৃত্যুর পরের অভিজ্ঞতা তথা মরণের পরবর্তী অবস্থান সম্বন্ধে জানানো সবিশদ তথ্যসম্বলিত একগুচ্ছ চাঞ্চল্যকর সত্যঘটনার রোমাঞ্চকর বিবরণ)

✪ বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন (মূল্য - ৬০/-)

(শ্রীধাম বৃন্দাবনে এক বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্না যুক্তিবাদিনী নারীর গোপালের অপার কৃপায় সিদ্ধ গোপালসাধিকায় রূপান্তরিত হওয়ার অপার্থিব অভিজ্ঞতার অভূতপূর্ব বিবরণ তথা বৃন্দাবনে যে গোপাল-শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা আজো কত অঘটন নিত্য ঘটান তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সত্যনিষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ)

✪ জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে (মূল্য - ৫০/-)

(গুরুদেবের সান্নিধ্যে এক মহাযোগীর হিমালয়ের ঈশ্বরকোটির যোগী মহাত্মাদের নিভৃত সাধনক্ষেত্র জ্ঞানগঞ্জ দর্শনের অনুপম অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকর সত্যনিষ্ঠ বিবরণ)

✪ কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন (মূল্য - ৭০/-)

(কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণা কিভাবে আজো তাঁদের শরণাগত ভক্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন তারই এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অপূর্ব নিদর্শন । সেইসাথে সমগ্র কাশীধামের প্রতিটি তীর্থের পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক তথা ঐতিহাসিক বিবরণও সার্থকভাবে

তুলে ধরা হয়েছে এই মহাগ্রন্থে)

✪ শ্যামের মোহন বাঁশী (মূল্য - ৬০/-)

(লেখকের আশ্রমের সদাজাগ্রত গোপালবিগ্রহ নানা অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়ে কিভাবে তাঁকে যুগিয়েছেন মহাজীবনের আশ্বাস সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকর বিবরণ)

✪ আজো লীলা করেন সাঁই (মূল্য - ৫০/-)

(শিরডির সমাধি মন্দিরে সাইবাবার জীবনচরিত ও বিদেহলীলা আলোচনা করাকালীন এক রহস্যময় সাই সাধকের কাছে লেখকের শোনা সাইবাবার এক অনুপম বিদেহলীলা — কিভাবে শিরডির সাইবাবা আপন অলৌকিক শক্তিতে এক বালককে লোককল্যাণের জন্য সাধকে রূপান্তরিত করেন এবং উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাকে নিয়ে যান সিদ্ধির লক্ষ্যে সেই অপার্থিব অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকর বিবরণ)

✪ ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন

১) ***মধ্যপ্রদেশ পর্ব*** **(মূল্য - ৬০/-)**

২) ***নাসিক শিরডি-দ্বারকা-প্রভাস পর্ব*** **(মূল্য - ৭০/-)**

৩) ***দক্ষিণ ভারত পর্ব*** **(মূল্য - ৯০/-)**

(**মধ্যপ্রদেশ পর্ব** — ইচ্ছামৃত্যুসম্পন্ন মহাযোগী রুদ্রানন্দজীর সান্নিধ্যে নর্মদাতীর্থ মধ্যপ্রদেশের সকল মহাতীর্থে ও বিশিষ্ট পর্য্যটন কেন্দ্রে, মুসাফির লেখকের ভ্রমণের রোমাঞ্চ কর বিবরণ এবং সেইসাথে রুদ্রানন্দজীর জীবন থেকে মহাজীবনে উত্তরণের অপার্থিব অভিজ্ঞতার অপূর্ব বিবরণ)

(**নাসিক শিরডি-দ্বারকা-প্রভাস পর্ব** — লেখকের একান্তে নাসিক-ত্র্যম্বকেশ্বর-শিরডি-শনি শিঙ্গনাপুর ভ্রমণ আর ইচ্ছামৃত্যুসম্পন্ন মহাযোগী রুদ্রানন্দজীর সান্নিধ্যে দ্বারকা-বেট দ্বারকা-হরসিদ্ধি-প্রভাস-সোমনাথের মত মহাতীর্থ দর্শনের রোমাঞ্চ কর বিবরণ)

(**দক্ষিণ ভারত পর্ব** — ইচ্ছামৃত্যুসম্পন্ন মহাযোগী রুদ্রানন্দজীর সঙ্গে লেখকের চেন্নাই, তিরুপতি, পণ্ডিচেরী, মহাবলীপুরম- পক্ষীতীর্থ- শিবকাঞ্চী- বিষ্ণুকাঞ্চী- শ্রীরঙ্গম-পুত্তাপুর্ত্তি-গুরুবায়ুর-মাদুরাই-রামেশ্বর-পদ্মনাভতীর্থ-ত্রিভান্দ্রাম-শুচীন্দ্রম-কন্যাকুমারীর মত মহাতীর্থ দর্শনের রোমাঞ্চ কর বিবরণ, রুদ্রানন্দজীর অতীতে সবরীমালা দর্শনকালীন মহাসিদ্ধিলাভের অভিজ্ঞতার অপূর্ব বিবরণ এবং সেইসাথে আগে থেকে বলে রাখা নির্দিষ্ট সময়ে ভক্তদের সৎসঙ্গে যোগসিদ্ধির পথ বলে দিয়ে রুদ্রানন্দজীর যোগবলে সজ্ঞানে মহাসমাধি গ্রহণের অপার্থিব অপূর্ব বিবরণ)

✪ From the world beyond death

-Translated by Saswati Das. (100/-), (U.S $ 10/-)

(A remarkable account of a yogi's visit to the higher dimensional world and his amazing experiences about afterlife gathered from the divine souls over there. This classic book,originally written by Tarashis Gangopadhyay and translated by Saswati Das is for everyone - young or old, male or female, religious or non religious - from all walks of life, because everyone in this planet is a spirit with a soul.)

✪ জন্মান্তর (মূল্য - ৫০/-)

(বিশিষ্ট মহাসাধক স্বামী বিদ্যানন্দের সৌজন্যে একজন ব্রহ্মচারী সাধকের আজ্ঞা চক্র পথে জন্মান্তর যাত্রার অপার্থিব বিবরণ। বিগত সাত জন্ম ধরে তাঁর প্রারব্ধ ও ঋণানুবন্ধ কিভাবে তাঁকে নিয়ে এসেছে বর্তমান জন্মের আধ্যাত্মিক স্তরে তারই এক রোমাঞ্চ কর বিবরণ এই গ্রন্থ)

✪ মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা (মূল্য - ৯০/-)

(লেখক কর্ত্তৃক মহাপ্রভু জগন্নাথদেব ও সচল জগন্নাথ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যলীলার ক্ষেত্র পুরীধাম পরিক্রমা এবং সেইসাথে ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ড গিরি, কোণারক, আলালনাথ ও নীলমাধব ভ্রমণের বিবরণ তথা সেখানকার সমস্ত তীর্থের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও পৌরাণিক মাহাত্ম্যের প্রেক্ষাপটের বিশদ বর্ণনা এই গ্রন্থের সম্পদ। সেইসাথে পুরুষোত্তম জগন্নাথদেব এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে আজো নীলাচলে নিত্য লীলা করেন তার কিছু বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার সত্যনিষ্ঠ বিবরণ)

✪ অনন্তের জিজ্ঞাসা (মূল্য - ৫০/-)

(আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রগতির জন্য ভক্ত(শিষ্য-শিষ্যা ও পাঠক পাঠিকাদের যে অসংখ্য সংশয়জড়িত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সবিশদ উত্তর দিয়েছেন সাধক লেখক তাঁর বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অধিবেশনে সেসব উত্তরের এক অনুপম সংকলন এই গ্রন্থ যা সকলকে অধ্যাত্মপথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে চিরকাল)

✪ কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন (মূল্য ৫০/-)

(২০১৩ সালে হিমালয়ের মহাতীর্থ কেদারনাথে বিরাট প্রলয়ের দিনে মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যে থেকেও কিভাবে লেখকের এক পাঠিকা অলৌকিকভাবে দেবাদিদেব কেদারনাথের অপার্থিব কৃপায় রক্ষালাভ করে ফিরে এসেছে তার এক রোমাঞ্চ কর অভিজ্ঞতার অনবদ্য বিবরণ)

✪ বৃন্দাবনমে আজভী ঘটনেবালে চমৎকার (মূল্য ১০০/-)

(লেখকের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন'-এর হিন্দী অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখিকা কেয়া সরকার)

✪ যেথা রামধনু ওঠে হেসে (মূল্য ৬০/-)

(লেখকের নানা ধরণের আধ্যাত্মিক, রোম্যান্টিক ও হাসির গল্পের সংকলন)

লেখকের আসন্ন প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ঃ

✪ জীবন থেকে মহাজীবনের পথে

***বাল্য পর্ব* (মূল্য - ৭০/-)**

(সাধক লেখক তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর প্রথম পর্ব। ছোটবেলায় কিভাবে অসংখ্য মহাসাধক ও সাধিকার সান্নিধ্য লেখককে প্রভাবিত করে তাঁকে সাধন জগতে নিয়ে এসেছে তার এক অপূর্ব বিবরণ লেখকের স্মৃতির পাতা থেকে)

✪ সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী (মূল্য ৬০/-)

(মহাপীঠ কালীঘাটের নাটমন্দিরে বসে জপ করাকালীন লেখকের কাছে এক গুপ্তযোগী আসেন এবং তাঁকে দেখিয়ে দেন যোগসিদ্ধির কিছু অপূর্ব প্রণালী। এই গ্রন্থে লেখক যেমন কালীঘাট মন্দিরের সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং পৌরাণিক মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন তেমনই সেই গুপ্তযোগীর সাধন জীবনের উপরেও আলোকপাত করেছেন। সেইসাথে তিববতের সেই গুপ্তযোগীর সাধনক্ষেত্র সাংগ্রীলার সবিশদ বিবরণও তিনি তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে)

✪ অনন্তের জিজ্ঞাসা - *দ্বিতীয় খণ্ড* **(মূল্য - ৫০/-)**

(লেখক কর্তৃক শিষ্য ভক্তদের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার সবিশদ উত্তর)

"শ্রীমান তারাশিসকে ছেলেবেলায় দেখেই জ্ঞানগঞ্জের মহাসাধক বহেরা বাবা আমায় বলেছিলেন — যোগীবাবা আপকা ইয়ে লেড়কাভী যোগী হোগা। আজ সেই ভবিষ্যদবাণী প্রমাণিত সত্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস — তারাশিস তার ঐশীকৃপাধন্য লেখনীর মাধ্যমে বহু ভক্ত মানুষকে যুগযুগান্ত ধরে নিয়ে যাবে মুক্তির দিশায়।" — **শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (মহাপীঠ তারাপীঠ, অলৌকিক লীলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-স্বামীজী সহ বহু গ্রন্থের লেখক)**

"Tarashis Gangopadhyay is a gifted author of several Bengali books and has a wide readership of his publications that covers his unique experience of meeting great sages and saints in the Himalayas during his travels and treking. He is spiritually highly elevated and has been instrumental in awakening many people in the path of light and love," — **Sri Sri Shuddhaanandaa Brahmachari. (President of Loknath Divine Life Mission and author of many books.)**

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা অধ্যাত্ম সাহিত্যের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ছেলেবেলা থেকেই আধ্যাত্মিক জগতের সাথে যুক্ত। সেই সময় থেকেই সাধক পিতা শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল সাধিকা মাতা শ্রীমতি মীরা গঙ্গোপাধ্যায় এবং অগণিত সিদ্ধ সাধক সাধিকার অমৃতময় সান্নিধ্য তাঁর মননশীল জগৎকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মহামণ্ডলেশ্বর শিবানন্দ গিরি মহারাজের পত্রিকা "পাঁচ সিকে পাঁচ আনায়" লেখকের প্রথম ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী "দিব্যধাম পুরীতে রথযাত্রা" প্রকাশিত হয়ে বিশেষ সম্মান লাভ করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রি অর্জনকারী এই সাধক লেখক যোগ ও ভক্তির পথে নিজ মুক্তির সাথে সাথে সকল ভক্তদেরও পরমের পথে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে নিয়োজিত। এই মানবকল্যাণের ব্রতে তাঁর ঐশীকৃপাসম্পন্ন লেখনীই মুখ্য মাধ্যম। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে"। তারপর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর একের পর এক আধ্যাত্মিক মহাগ্রন্থ — দেবলোকের অমৃতসন্ধানে (চার পর্বে সমাপ্ত — যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখ পর্ব, বাসুকীতাল-কালিন্দী খাল-বদ্রীনাথ পর্ব, পঞ্চবদ্রী-পঞ্চপ্রয়াগ-পঞ্চকেদার পর্ব, নেপাল পর্ব), অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান, বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন, জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে, কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন, শ্যামের মোহন বাঁশী, ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন (তিন পর্বে সমাপ্ত — মধ্যপ্রদেশ পর্ব, নাসিক-শিরডি-দ্বারকা প্রভাস পর্ব, দক্ষিণ ভারত পর্ব), আজো লীলা করেন সাই, FROM THE WORLD BEYOND DEATH, জন্মান্তর, মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা, অনন্তের জিজ্ঞাসা এবং কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন। প্রতিটি গ্রন্থই সাধুসমাজ, পাঠকসমাজ তথা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা কর্তৃক বিরাট সমাদর লাভ করে। এই গ্রন্থগুলিতে আজো নিত্য ঘটমান অলৌকিক লীলার উপর রচিত অবিস্মরণীয় সত্যঘটনাগুলি লেখককে যেমন আপামর জনসাধারণের আরো কাছে নিয়ে এসেছে তেমনই পাঠক-পাঠিকাদেরও অবিরত সাহায্য করে চলেছে তাঁদের আত্মোপলব্ধির পথে — জীবন থেকে মহাজীবনে উত্তরণের লক্ষ্যে। এইভাবেই লেখক বর্তমানে জগৎ ও জীবের কল্যাণে আপন ঐশীনির্দিষ্ট ব্রতে একান্তভাবে নিয়োজিত।

ISBN NO : 978-93-82325-11-6

লেখকের Website :
Http://spiritualbooksoftarashisgangopadhyay.blogspot.in